কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

নবীন ভক্তদের জন্য

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা

ভক্তি বিকাশ স্বামী

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবীন ভক্তদের জন্য

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা

শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ স্বামী রচিত ইংরেজী A Beginners Guide to Krishna Consciousness – গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

পারমার্থিক জীবন লাভের ব্যবহারিক পথনির্দেশ

অনুবাদক ঃ গোপাল বিশ্বাস

শ্রীমদ্ ভক্তি বিকাশ স্বামী

ইস্‌কন রিভিউ বোর্ডের অনুমোদনমূলক বিবৃতি

এই গ্রন্থটির নিরীক্ষক হিসাবে তাঁর মূল্যায়নে এইচ, এইচ, গুণগ্রাহী গোস্বামীর অভিমত ঃ - ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক উপস্থাপিত কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন ও তার প্রয়োগ থেকে এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কোনভাবেই বিচ্যুত হয়নি।

এবিষয়ে আরো জানতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্রবিনিময়ের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ঃ

প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ ঃ ১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ ঃ ৫,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০ ঃ ৫,০০০ কপি

ইস্‌কন,
৫, চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট,
ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

উৎসর্গ

এই গ্রন্থটি পাঠকবৃন্দকে উৎসর্গ করা হল। যদি গ্রন্থটি আপনাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রগতিসাধনে সাহায্য করে, তাহলে দয়া করে আমাকে কৃপাশীর্বাদ করার কথা স্মরণ রাখবেন যাতে আমারও কিছু পারমার্থিক উন্নতি লাভ হয়।

ভক্তিবিকাশ স্বামী

বিষয় – সূচী

মায়াবাদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য

'মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'।

– শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬, ১৬৯

শ্রীল প্রভুপাদ তার গ্রন্থাবলীর সর্বত্র পুনঃ পুনঃ মায়াবাদী-দের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। ''মায়াবাদী'' আখ্যাটি প্রায়ই 'জড়জাগতিক ভোগবিলাসে লিপ্ত বিষয়াসক্ত মানুষ'-কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত অর্থে "মায়াবাদী" বলতে মায়াবাদ দর্শনের অনুগামীকে বোঝায়। মায়াবাদ হল আদি শঙ্করাচার্য প্রচারিত 'অদ্বৈতবাদ' এর অপর নাম।

মায়াবাদ অনুসারে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে সম্পাদিত সেবামূলক কর্ম (ভক্তি)–সবই হল মায়ার সৃষ্টি। তারা বিশ্বাস করে সে সবকিছুই ''এক'' (অদ্বৈত) এবং অধ্যাত্ম-জীবনের চরম লক্ষ্য হল ভগবানের সংগে লীন বা এক হয়ে যাওয়া। এদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী; এরা ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করে। পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ–একথা তারা স্বীকার করতে চায় না।

এই মায়াবাদ-দর্শন সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। পরমেশ্বর ভগবান হতে মানুষের মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে, 'তারা ভগবানের সংগে এক হয়ে যেতে পারে'– মানুষকে এরকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই মায়াবাদ বিশ্বের পারমার্থিক জীবনধারায় এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্য বৈষ্ণব আচার্যবর্গ, বিশেষ করে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ়তার সাথে মায়াবাদের বিরোধিতা করেছেন। বহুবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ এবং সাধারণ জ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি-বিচারের সাহায্য মায়াবাদ–দর্শনের অসংখ্য

মৌলিক দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করে তারা সুসম্বদ্ধভাবে এই মতবাদ খন্ডন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু) হচ্ছেন পরমপুরুষ -এটিই হল পরম সত্যের যথাথ উপলব্ধি। ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যকে দ্ব্যার্থহীনভাবে প্রতিপাদন করেছেন। এবং সকল বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শীগণ তা গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। তিনি নিরাকার নন, তিনি শাশ্বত কাল ধরে তার নিত্য চিন্ময় রূপে ('সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' রূপে) বিরাজিত। ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, এবং অপর সকল জীব তার নিত্য সেবক - এটাই হল অপ্রাকৃত পারমার্থিক সত্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি সেই জন্য আমাদের ভগবান হবার চেষ্টা করা উচিত নয় ; আমাদের কেবল বিনম্রচিত্তে ভগবানের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে, তাঁর শরণাগত হতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর পূর্বতন মহান বৈষ্ণব আচার্যগণের অনুসৃত ধারায় সর্বদাই মায়াবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বারবার দৃঢ়ভাবে এই মতবাদের দোষক্রটি অসারতা তুলে ধরে তা খন্ডন করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমুহে সর্বত্রই মায়াবাদ ও মায়াবাদীদের উল্লেখ রয়েছে, তবে বিষয়টির সামগ্রিক বিশ্লেষণ পেতে হলে পাঠকবৃন্দকে "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা" গ্রন্থটি অধ্যায়ন করতে হবে।

মুখবন্ধ

এই বইটি বিশেষতঃ ভারতের সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরনের উদ্দেশ্যে রচিত। এটি সকল প্রধান ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের উপযোগী। অনুবাদকেরা চাইলে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংগে সংগতিসাধনের উদ্দেশ্যে গ্রনন্থটির কিছু গৌণ পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

বইটিতে আলোচিত কিছু বিষয় যেমন কীর্তন, জপ, তিলক প্রভৃতি যে কোন নূতন কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারীর পক্ষে জানা অপরিহার্য। আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এমন আরও কিছু বিষয় বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা নবীন ভক্তি অনুশীলনকারীদেরকে পারমার্থিক জীবনের এক সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে - যেমন, "কৃষ্ণভাবনামৃতকে যথাযথরূপে উপলব্ধি," "নারীপুরুষ সংসর্গে বিধিনিষেধ" ইত্যাদি।

বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের কিছু মৌলিক বিষয়ও এখানে আলোচিত হয়েছে, যা অপর একটি বইয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার রয়েছে।

আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই বাংলাভাষায় এই ধরণের একটি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিছি। 'বৈষ্ণব শিক্ষা ও সাধনা' নামের এই গ্রন্থটি বাংলাদেশে বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি আশা রাখছি যে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচাররত কোন ভক্ত এরকম একটি বিশদ নির্দেশিকাগ্রন্থ প্রকাশ করবেন যা পাশ্চাত্যের ভক্তজীবন লাভেচ্ছুদের উপকার সাধন করবে। বর্তমান বইটি এরকম একটি গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ হতে পারত, কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীদের যেহেতু ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সুবিধাটি নেই, সেজন্য তাদেরকে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন রয়েছে।

ভক্তিবিকাশ স্বামী

ভূমিকা

মানবজীবন কেবল বিচারবুদ্ধিবর্জিত খেয়ালখুশিমত বেঁচে থাকা-মাত্র নয়; মানবজীবনের উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান এবং ভক্তিযোগের পন্থায় তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। এই কলহ ও প্রবঞ্চনার যুগ কলিযুগে সবচেয়ে প্রামাণিক ভক্তিপথ হল সেটিই যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন।

এই ধরণীতে আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর্বিভূত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ স্বয়ং এবং তিনি আত্মোপলব্ধির সবচেয়ে সরল পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন—তা হল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ভগবানের এই দিব্যনাম পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। তাঁর বাণী ফলপ্রসূ হয়েছে ; এই দিব্যনাম কীর্তন এখন আর কেবল ভারত ভূমিতেই আবদ্ধ নেই, সমগ্র বিশ্বে আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের এই পন্থাকে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাসমূহ অবলম্বন করে শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইর্য়ক শহরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই জগৎ থেকে অপ্রকট হয়েছেন ১৯৭৭ সালে, কিন্তু তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন, তা ক্রমবর্দ্ধমান।

প্রতিদিন আরও বেশি বেশি মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং ইসকন ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে অনেকেই কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে অভিলাষী হচ্ছেন।

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন খুবই সহজ, কিন্তু এর পন্থা-পদ্ধতি শেখার জন্য অপরের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অনেকেই পরিস্থিতিগত কারনে (যেমন ইসকন কেন্দ্র থেকে দূরে বাস করা) অভিজ্ঞ ভক্তের ব্যক্তিগত সহায়তা লাভে বঞ্চিত হন, ফলে কৃষ্ণভাবনামৃতে অনুরক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা গ্রহণ করতে পারেন না।

বিশেষতঃ এইরকম ব্যক্তিদের জন্যই এই বইটি রচিত। কিভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে হবে, গৃহে পূজার্চনা করতে হবে, তিলক নিতে হবে, উৎসবাদি পালন করতে হবে – ব্যবহারিক সবকিছুই দিক্‌নির্দেশ এই বইয়ে রয়েছে। এই বইয়ে অধিকাংশ পন্থা-পদ্ধতি সকল ভক্তগণের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য, তবে কেবল গৃহস্থদের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশ এখানে সংযোজিত হয়েছে।

অবশ্য, বইটি কারও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণের কখনই বিকল্প হতে পারে না। নিজেকে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করতে প্রয়াসী নবীন ভক্তকে অবশ্যই কারও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "যারা সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধনে ভগবদ্ভক্তির, শিক্ষালাভ করেননি, তাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে এমনকি উপলব্ধি করতে শুরু করাটাও অসম্ভব" (ভগবদ্‌গীতা, ১১-৫৪, তাৎপর্য)।

সুতরাং এই বইটি কেবল সদ্‌গুরুর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের সম্পুরক ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ এই বইয়ে আলোচিত তিলক গ্রহণ করা, কীর্তন করা ইত্যাদির মত বিষয়গুলি অভিজ্ঞ ভক্তদের দেখে সরাসরিভাবে তাদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া প্রয়োজন।

এই বইয়ে বিধৃত নিয়ম-নির্দেশাদির ভিত্তি হল ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব হতে পরম্পরাক্রমে আগত বৈষ্ণব-ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচরিত পন্থা, যা হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং শ্রীউপদেশামৃতের মত প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এ -বইয়ের শিক্ষা নির্দেশাদির ভিত্তি হচ্ছে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ।

পূর্বতন মহান আচার্যবর্গ এবং শাশ্বত শাস্ত্রসমূহ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়েও শ্রীল প্রভপাদ আধুনিক মানুষের উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে উপস্থাপন করেছেন।

বৈষ্ণবীয় আচার অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে নবীন কৃষ্ণভক্তদের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও বইটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অবশ্য এখানে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন আলোচনা করা হয়নি, কেননা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহেই তা বিশদভাবে রয়েছে। যারা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্বাসী হয়েছেন ও নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, এই বইটি তাদের সাহায্য করবে। এই বইয়ে আলোচিত আচার-অভ্যাসাদি যুক্তিসিদ্ধভাবে গ্রহণ করতে হলে নিষ্ঠাবান পাঠকবৃন্দের নিয়মিতভাবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করা কর্তব্য।

কৃষ্ণভক্তির এই সরল বিধিনির্দেশগুলি অনুসরণের মাধ্যমে বয়স, জাতি, ধর্মমত, নারী-পুরুষ বা যোগ্যতা-নির্বিশেষে যে-কোন মানুষ সহজেই তাঁর অস্তিত্বকে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারেন। এভাবে তিনি ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম বিকশিত করতে পারবেন ; তিনি নিশ্চিতভাবে এই জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাময় আবর্ত হতে চিরতরে রক্ষা পাবেন এবং আনন্দময় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত মহান সংকীর্তন আন্দোলন সারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে এই অনবদ্য সুযোগ দান করছে।

বর্তমান গ্রন্থকার তাই পূর্ণ নিষ্ঠার সংগে কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করার জন্য সকল পাঠকবৃন্দের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আহ্বান করছেন, "জীব ! জাগো, জেগে ওঠো ! আর কতদিন মায়া পিশাচীর কোলে ঘুমিয়ে থাকবে ? তোমাদের জড়রোগ নাশ করার জন্য আমি ওষুধ এনেছি। আর তা হল নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের উদ্দেশ্য

আমরা স্বরূপতঃ দেহ নই, চিন্ময় আত্মা। দেহ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রতিটি দেহে-অবস্থানকারী জীবাত্মা নিত্য, অবিনশ্বর। প্রত্যেক জীবাত্মার সংগে পরমাত্মা – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক নিত্য, আনন্দময় মধুর সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের প্রকৃত জীবন এই জড়জগতে নয় – তা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামে।

অপ্রাকৃত জগৎ সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রভুত্বাধীন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগণিত প্রেমপরায়ন সেবকগণের দ্বারা নিয়ত পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন। এই সেবকগণ পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধভক্ত। তাঁরা সকলেই পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত ; তাদের কেবল একটি বাসনা রয়েছে ঃ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করা। জড়জাগতিক কামনা-বাসনা লোভ ও ঈর্ষা থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

চিন্ময় জগতে ভূমি, বৃক্ষসমূহ, গৃহাদি, জল – সবই অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আনন্দময়। সেখানে শোকদুঃখের কোন অস্তিত্ব নেই – রয়েছে কেবল অবিচ্ছিন্ন আনন্দসম্ভোগ। এই আনন্দ জড়জগতের পুঁতিগন্ধময় অলীক ইন্দ্রিয়সুখ নয় – তা হল কৃষ্ণ-সম্বন্ধিত প্রকৃত অর্থপূর্ণ চিন্ময় পরমানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ গোলক-বৃন্দাবনে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত-পার্ষদগণের সংগে নিত্যকাল ধরে চিন্ময় বৈচিত্র্যে পূর্ণ অনুপম লীলাবিলাস সম্পাদন করছেন। এটি হল পরমপুরুষ ভগবানের সংগে নৃত্য, গীত ক্রীড়া এবং ভোজনের এক মধুর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসব।

যে-সমস্ত জীবসত্তা ভোগকামনাজনিত প্রমত্ততা-বশতঃ কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে, তারা জড়জগতে অধঃপতিত হয়। এই জড়জগৎ হল শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করার এক কারাগার বা সংশোধনাগার বিশেষ। বদ্ধজীব এখানে চুরাশি লক্ষ জীব-প্রজাতির বিভিন্ন জীবদেহে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হচ্ছে। মায়ার প্রভাবে এবং মিথ্যা অভিমানে মোহিত হয়ে বদ্ধ জীবাত্মা এমনকি একটি বিষ্ঠাহারী শুকর-দেহে অবস্থানকালেও

নিজেকে সুখী বলে কল্পনা করছে। এই জড়জগতের নিম্নতম থেকে উচ্চতম লোক- সবই দুঃখ শোকের এক মহাসাগর ছাড়া কিছু নয়।

আমরা এই জড়জগতে অন্তঃহীন দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে চলব - কৃষ্ণ তা চান না। তাঁর সংগে চিরকাল আনন্দে বাস করার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা "শ্রীভগবদ্‌গীতা যথাযথ"-তে বিধৃত তাঁর কথা শ্রবণ করছেন এবং তাঁরা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-র সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা তাঁদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিময় ভক্তিসেবায় নিযুক্ত হচ্ছেন।

কৃষ্ণ স্বয়ং এই কলিযুগে তাঁর সবচেয়ে করুণাময় অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন, যা হল ভগবানকে জানার সবচেয়ে আনন্দময় পন্থা। এটি হচ্ছে 'কেবল আনন্দ-কন্দ'।

কৃষ্ণভাবনামৃত মানেই হল সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, পরমানন্দে নর্তন, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, শুদ্ধ ভক্তসঙ্গলাভ, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন, শ্রীবিগ্রহের অনুপম সৌন্দর্য-আস্বাদন, কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ এবং কৃষ্ণ- মহিমা কীর্তন। এটি হল এক ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দের জীবন এবং এভাবে এমন স্তরে উপনীত হওয়া যায় যেখানে আমরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারি এবং সরাসরি তাঁর সংগে কথোপকথন করতে পারি।

জীবনে যথার্থ পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত হল একটি পরীক্ষিত, আচরিত এবং প্রমাণিত পন্থা। অতীতে বহু বহু ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনা দ্বারা নির্মল, বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের প্রতি যে অপূর্ব করুণা প্রদর্শন করেছেন, তা কেবল যাঁরা

পারমার্থিক দিক দিয়ে উন্নত চেতনাসম্পন্ন তাঁরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাঁরা কৃষ্ণভক্তিকে পূর্ণ ঐকান্তিকতায় গ্রহণ করেন এবং এই জন্মকেই জড়জগতে তাঁর অন্তিম জন্মে পরিণত করার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

এমনকি সামাজিক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেও কৃষ্ণভাবনামৃত এতই সুন্দর যে তা প্রত্যেকেরই বহুবিধ কল্যাণ সাধন করে। কেবল ভক্তিমূলক সেবাচর্চার মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে সকল সদ্‌গুণের স্ফুরণ ঘটে। তাঁরা দয়ালু, সহনশীল, সংযমী, বিনম্র, শান্ত এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এছাড়া, কৃষ্ণভাবনামৃত এমনকি সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ধর্মীয় সমস্যাসমূহেরও পরম সমাধান দেয় (কিভাবে, তা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহে পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে)।

সেইজন্য প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের কর্তব্য হল কালক্ষেপ না করে পূর্ণ ঐকান্তিকতায় কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করা।

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম স্বার্থক করি কর পর উপকার ॥'

(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭/১৪৮)

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৭৩)

ভিত্তি ঃ গুরু, সাধু এবং শাস্ত্র

"শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন – 'সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য'। অর্থাৎ পারমার্থিক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য সাধু, শাস্ত্র এবং সদ্গুরুর শিক্ষানির্দেশ একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য। সাধু বা সদগুরু– কেউই শাস্ত্র সমুহের অনুমোদন ব্যতীত কিছু বলেন না। সদ্গুরু এবং সাধুর বাণী তাই সর্বদা শাস্ত্রানুগ হয়ে থাকে। তত্ত্বোপলব্ধির এই সব উৎসগুলির সঙ্গে তাই পূর্ণ সঙ্গীত রক্ষা করে ভগবদ্ভক্তি লাভে ব্রতী হওয়া উচিত।"

– প্রভুপাদ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪-৮, তাৎপর্য।

কৃষ্ণভক্তির দর্শন এবং অনুশীলন পদ্ধতি গুরু, সাধু এবং শাস্ত্র দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। শাস্ত্র হচ্ছে ভগবানের বাণী বা ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন এমন শুদ্ধভক্তদের বাণী (সমভাবে প্রামাণিক)। সাধুরা কঠোর ভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করেন, কিন্তু কেবল সেই সমস্ত শাস্ত্রকেই যথার্থ প্রামাণিত বলে জানতে হবে যেগুলি মহান বৈষ্ণব আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

যা প্রকৃত, খাঁটি, তা নিয়ে খেয়ালখুশিমত কিছু করা চলে না। পরম সত্য আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাসিয়ে তোলা কিছু জল্পনা-কল্পনার বিষয় নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত হল পরমতত্ত্ব, তা নিত্য শাশ্বত ভগবদ্ভক্তির পন্থার মাধ্যমে পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মা, নারদ, শিব-সহ সকল মহান সাধকগণ এবং মহাজনগণ দ্বারা এই পন্থা স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি আজও অবিচ্ছিন্ন গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে সেই পন্থা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং ভক্তদের দেখে নিজেরা ভক্তিচর্চার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তসঙ্গ ও যথাযথ পরামর্শের

অভাবে প্রায়ই তাঁরা খুব বেশি উন্নতিলাভ করতে পারেন না। তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত উপলব্ধি ও অনুশীলন প্রায়ই ভুল পথে ধাবিত হয়। অজ্ঞতা এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সংগে নিজের কল্পিত ধারণা মিশিয়ে ফেলার প্রবণতাই এর কারণ।

এক অর্থে, যেভাবেই হোক কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন শুরু করে দেওয়া খুব ভাল। কিন্তু ভক্তিযুক্ত সেবায় যদি সত্যিকার সাফল্য লাভ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই প্রামাণিক পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। এজন্য বিনীতভাবে একজন সদ্গুরুর পরামর্শ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেবল বাহ্যিকভাবে কিছু ভক্তিচর্চা করে নিজেকে ধার্মিক মনে করাটাই যথেষ্ট নয়।

যাঁরা ভক্তি চর্চা শুরু করতে ইচ্ছুক অথচ কারও ব্যক্তিগত সাহায্য নিতে পারছেন না, এই বইটি যথাযথভাবে আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনে তাদের সাহায্য করবে। নবীন ভক্তরা যাতে অযথা ভক্তিপথে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন সে-ব্যাপারে বইটি তাদের সাহায্য করতে পারে। কারণ বইটি গুরু-সাধু-শাস্ত্র-নির্দেশের অভ্রান্ত ভিত্তির উপর রচিত। অন্ততঃ কিভাবে তিলক ধারণ, বা সংকীর্তন করতে হবে – সে সবের যথাযথ নির্দেশ এখানে রয়েছে। কিন্তু একজন সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করা, প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখে নেওয়া এবং বিনম্রচিত্তে তাঁর সেবা করা একান্তই প্রয়োজন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১/ ৪৫)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরান ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১২২)

কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্বকে যথাযথরূপে উপলব্ধি

ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কম-বেশি অবগত। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু অসাধু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেছে। ফলে, স্বাভাবিক কৃষ্ণভাবনাময় প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা এখন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সেজন্য যাঁরা বিশুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে চান, তাদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে তাঁরা ইতিপূর্বে যা শুনেছেন তা আসলে পুরোপুরি ভুলে ভরা। এবং তা আমাদের বিপথগামী করে।

বর্তমানে প্রচলিত প্রধান কিছু ভ্রান্ত ধারণা এরকম ঃ

১. কৃষ্ণ একজন পৌরাণিক ব্যক্তি। প্রকৃত-পক্ষে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিলনা (এবং এখনও নেই)।

২. কৃষ্ণ একজন মহান মানব ছিলেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান বলে কিছু নন।

৩. কৃষ্ণ ছিলেন নৈতিকতাবর্জিত।

৪. অনেক দেব-দেবী বা ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁরা সকলেই এক, আর তাদের কারও পূজা কৃষ্ণ-পূজারই সমতুল।

৫. ধ্যান-চর্চা এবং সাধনার দ্বারা যে-কেউ কৃষ্ণের মত ভগবান হয়ে যেতে পারে।

৬. ব্যক্তি কৃষ্ণের পূজা নয়, কৃষ্ণের মধ্যেকার জন্মরহিত শাশ্বত সত্তার পূজা করা কর্তব্য।

৭. যখন কৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হবেন ও কৃপা করবেন, তখন আমি তাঁর প্রতি শরণাগত হব।

৮. ভক্তি হচ্ছে জ্ঞান লাভ করার একটি ক্রম বা ধাপ মাত্র।

এই সব মনগড়া ধারণাগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, এগুলির কোন শাস্ত্র সমর্থনও মেলেনা। এগুলি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-ভাবেই হোক হিন্দু সমাজে এই ধারণাগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এরকম ডজন ডজন কল্পনাপ্রসূত বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে। তা প্রচার করছে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কিছু লোক যাদের একমাত্র কাজই হল নিজেদেরকে ধার্মিক হিসাবে জাহির করা, আর সেই সাথে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য - যা হল পূর্ণ ভগবৎশরণাগতি – সে-উদ্দেশ্য থেকে তাদের অনুগামীদেরকে বিচ্যুত করা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং এই প্রকার পূর্ণ শরণাগতি তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষা করেন ঃ

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।"

ভগবদ্গীতা, ১৮/৬৬

অনেকেই রয়েছে যাদের ধার্মিক সাধু বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের যদি সর্বকারণের পরমকারণস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হতে বলা হয়, তাহলে তাঁরা সরাসরি তা করতে অস্বীকার করে। ভগবদ্গীতায় শ্রী কৃষ্ণ এঁদেরও বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিকভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনো আমার শরণাগত হয় না।" ★

ভগবদ্গীতা - ৭/১৫

★ এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন।

যারা ভগবানের শুদ্ধভক্ত হতে অভিলাষী, তাদের অবশ্যই এইসব অভক্ত এবং কপট সাধুদের দ্বারা কলুষাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

যে প্রধান দুই মতবাদ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা হতে বিচ্যুত হয়েছে সেগুলি হল মায়বাদ এবং সহজিয়াবাদ।

মায়াবাদীরা হল নির্বিশেষবাদী, যারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে পরমতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের লক্ষ্য হল 'ভগবানের সংগে এক হয়ে যাওয়া ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলেছেন, "মায়াবাদী জন হয় কৃষ্ণ অপরাধী" -(চৈতন্যচরিতামৃত)। কেন তারা অপরাধী, শ্রীল প্রভুপাদ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন- চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা -৭/ ১৪৪, তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

মোটকথা হল, মায়াবাদ দর্শন আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "মায়াবাদ ভারতে বৈদিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে" (-Conversation - 5-7-76)।

ভক্তি মানে হল শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ কর্তৃত্ব , তাঁর অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর নিত্য চিন্ময় রূপ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদীরা ভগবানের সংগে সাধারণ জীবসত্তাকে সমান বলে দেখানোর অযৌক্তিক প্রচেষ্ঠা করে, আর এই প্রচেষ্টা ভক্তির ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দেয়। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যারা শাস্ত্রের মায়াবাদী ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তাদের সর্বনাশ হয়, তাদের পারমার্থিক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ★

সহজিয়ারা হল কপট ভক্ত, যারা ভক্তিচর্চাকে অত্যন্ত হাল্কাভাবে গ্রহণ করে থাকে। ভক্তি চর্চার বিধি-সম্মত নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ না করেও তারা নিজেদের অত্যন্ত উন্নত ভক্ত বলে কল্পনা করে।

★ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীতে, বিশেষতঃ 'ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থের তাৎপর্যে মায়াবাদ দর্শনকে সুদৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সুস্পষ্ট যুক্তিতে বিশদভাবে চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলার ৭ম অধ্যায়ের তাৎপর্যে মায়াবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর মৌলিক রচনাগুলিতে (বৈরাগ্য বিদ্যা গ্রন্থে সংকলিত) বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে।

আরও কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কৃষ্ণভক্তিকে জনসাধারণের মধ্যে একটি ব্যবসাতে পরিণত করেছে। এরা হল কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত পেশাদার ভাগবত পাঠক, পেশাদার ভজন-কীর্তন গায়ক, কৌতুকপূর্ণ ধর্মীয় পুস্তক প্রণেতা, এবং ভণ্ড গুরুর্গণ। তারা যদিও খুব চমৎকার কৃষ্ণকথা বলতে পারে বা সুন্দর ভাবে গাইতে পারে, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল অর্থোপার্জন করা।

এরপর রয়েছে আরও অসংখ্য ভক্ত যারা প্রামাণিক বৈষ্ণব ধারা অবলম্বন করলেও বাহ্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে তারা তা হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং এইভাবে তারা বৈষ্ণবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভগবান বিষ্ণুর প্রতি শরণাগতির মূল মনোভাবটিই হারিয়ে ফেলেছে।

এইরকম-সব মানুষই নকল ভণ্ড অবতারদের উপাসক। কলহ ও প্রবঞ্চনার যুগ এই কলিযুগে পরিবেশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে পড়েছে, আর সেজন্য এইসব নকল অবতারেরা মুর্খ লোকদের মনকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছে যে তাদের পূজা কৃষ্ণের পুজা থেকেও অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এরকম সব "ভগবান"-দের অর্থহীন বাগাড়ম্বরকে তাদের বিভ্রান্ত অনুগামীরা পবিত্র দর্শনতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সমস্ত শ্রেণীর এইসব অভক্ত, আধাভক্ত এবং কপট ভক্তেরা যদিও ভক্তিময় আচরণ করছে বলে ভান করে, আসলে তারা বিভ্রান্ত, বিপথগামী। তারা জড়সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হবার ফলে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে ঈর্ষাপরায়ণ হবার ফলে তাদের সমস্ত প্রার্থনা, মন্ত্র এবং পুজাকে যথার্থ পরম্পরাক্রমে আগত ভক্তেরা প্রকৃত ভক্তি বলে স্বীকার করেন না।

শ্রীল রূপগোস্বামী এ সম্বন্ধে সতর্ক করে বিষ্ণুযামলের এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন ঃ

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হর্রেভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধিনির্দেশ-বহির্ভূত ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত হরিভক্তিও কেবল উৎপাত বিশেষ বলে পরিগণিত হয়।"

– ভক্তিরসামৃতসিন্ধু. ১-২-১০১

বর্তমান ভারতে সবধরণের বিকৃত, কাল্পনিক মত-বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রকৃত ধর্মানুশীলন চলছে। আজকের সমাজে অসংখ্য সব তথাকথিত যোগী, স্বামী, গুরু, বাবা, অবতার, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনকারী, ফকির এবং ভণ্ড ভগবানেরা জুড়ে বসেছে ; তাঁরা সমস্ত ধরণের উদ্ভট ব্যাপার শেখাচ্ছে আর সববিষয়েই 'উপদেশ' দান করছে, কিন্তু কেবল এইতত্ত্বটি বাদ দিয়ে ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি।

বস্তুতঃ যা কিছু বাজে, মেকি তাই চলছে, আর যা খাঁটি, অকৃত্রিম তা দুর্লভ, বিরল হয়ে উঠেছে। মেকিই যেন এখন আসলের স্থান দখল করেছে।

এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞদের কাছে আসল-নকলের পার্থক্য বোঝা খুব কষ্টসাধ্য। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণভক্তগণকে মনে হয় "আরেকটি হিন্দু ধর্মগোষ্ঠী"। আদর্শ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত অন্যান্য অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের নিজ নিজ ভজন পদ্ধতি, মন্দির, উৎসব, শাস্ত্র,গুরু, তিলক – ইত্যাদি সবই রয়েছে। সেজন্য সরল জনগণ ব্যাপারটাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে প্রথমেই সিদ্ধান্ত করে ঃ "সব পথই এক"।

কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার পন্থার সাথে অপর সমস্ত পথেরই বিশাল প্রভেদ রয়েছে। প্রভেদটি হল, একমাত্র প্রকৃত পূর্ণসত্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত, যা সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে নির্ণীত হয়েছে, এবং সমস্ত তত্ত্ববিদ্ আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কেবল কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান (বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাধারা অনুসারে) আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে সমস্ত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা হতে মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক হিসাবে আমরা আমাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্তির এই পন্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিলায শুন্য হয়ে শুষ্কজ্ঞান-চর্চা এবং

সকাম কর্মানুষ্ঠান হতে মুক্ত হয়ে আনুকুল্যতার সাথে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তি।"

– ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১-১-১০।

কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভে প্রয়াসী প্রত্যেক নবীন ভক্তের এই পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই কৃষ্ষভাবনামৃত আন্দোলন নূতন আরেকটি হিন্দু সম্প্রদায় তৈরী করছে না বা নূতন কোন দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করছে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হল এক সাংস্কৃতিক, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আন্দোলন যা সমগ্র বিশ্বকে পুনরায় পারমার্থিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করবে। সভ্যতার এক চরম দুর্দিনে গভীর তমিশ্রা থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার জন্য এই আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হবে। * "কৃষ্ণভাবনামৃত একটি গুরুতর শিক্ষাণীয় বিষয়, এটি কোন সাধারণ ধর্মমতমাত্র নয়" (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা-থেকে)। "আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি অকৃত্রিম, ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপ্রাকৃত আন্দোলন, কারণ তা ভগবদগীতার যথার্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" (–শ্রীল প্রভুপাদ, ভূমিকা, ভগবদ্গীতা যথাযথ)। "কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যগত এবং স্বাস্থ্যবিদ্যাগত প্রচলিত নিয়মনীতির আমূল পরিবর্তন" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ১৮-১-৬৯)। "আমাদের কর্মসূচী অত্যন্ত মহৎ। আমাদের দর্শন বাস্তবানুগ এবং প্রামাণিক ; আমাদের চরিত্র-বিশুদ্ধতম, আমাদের কর্ম প্রণালী সরলতম; কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য সবচেয়ে মহৎ" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৯-৩-৭০)।

কৃষ্ণভাবনামৃত তাই তাত্ত্বিক ভিত্তিহীন ধর্মীয় আবেগ থেকে সৃষ্ট নূতন আরেকটি 'ধর্মমত' নয়। এটি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, স্মরণাতীত কাল ধরে যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক যেমন এখন তা দেওয়া হচ্ছে। সত্য কখনও পরিবর্তিত হয় না, বা সত্যকে কখনো কালের বিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত হল অলীক মায়া হতে

* পূর্ববাক্য ও এই বাক্যটি শ্রীল প্রভুপাদের রচনা হতে উদ্ধৃত।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃত বাস্তব, মিথ্যা হতে স্বতন্ত্র সত্য, অন্ধকার থেকে পৃথক আলোক। জড়জগতের কোন মত-বিশ্বাস-দর্শনের সংগে কৃষ্ণভাবনামৃত কোন ভাবেই তুলনীয় নয়।

ভক্তজীবনে যথাযথভাবে উন্নতিলাভ করতে হলে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন তত্ত্বগত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভক্তিচর্চার কিছু আচার-পদ্ধতি (এই বইয়ে যেমন দেওয়া হয়েছে) অনুকরণ করলে আশানুরূপ ফললাভ দুঃসাধ্য। অন্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন।

কৃষ্ণভক্তিমূলক সমস্ত কাজকর্মই সর্বদা কল্যাণপ্রদ ; কিন্তু যদি দ্রুত উন্নতি করতে হয়, তাহলে সমস্তরকম জড়জাগতিক ধর্ম-পন্থার সংগে সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন ঃ

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেক; শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।"
–ভগবদ্গীতা, ১৮–৬৬।

ধর্মপন্থাগুলি মধ্যে কোনটা অকৃত্রিম বিশুদ্ধ আর কোনটা কৃত্রিম, মেকি–তা বুঝতে হলে কিছু জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন – বিশেষতঃ যাঁরা বিভিন্ন ভুল ধারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পক্ষে এটা খুব জরুরী। তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী নিয়মিত পাঠ করা (এমন কি, যদি কেউ বহু গ্রন্থপাঠে সক্ষম না হয়, তা হলে কেবল ভগবদ্গীতা যথাযথ পাঠ করলেই তাদের সকল সন্দেহের নিরসন হবে। কেননা, এই একটি গ্রন্থেই শ্রীল প্রভুপাদ অবিসংবাদিতভাবে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা এবং অপর সকল পন্থার নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করেছেন)।

এই সাথে, সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করাও দরকার, যাঁরা ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত। ★

★ প্রবঞ্চনাপূর্ণ ধর্মকে বলা হয় কৈতব ধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবত দ্রষ্টব্য।

এ-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, যে-সমস্ত ভক্ত ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাদের উচিত এই সমস্ত শুষ্ক জ্ঞানী, স্বর্গলোক লাভের অভিলাষী কর্মী এবং মুক্তিকামী নির্বিশেষবাদীদের প্রভাব থেকে সাবধানতার সঙ্গে তাদের ভগবদ্ভক্তিকে রক্ষা করা। ভক্তদের উচিত ভগবৎপ্রেমরূপ মহামূল্যবান রত্ন দস্যু এবং তস্করদের নিকট থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ শুষ্কজ্ঞানী এবং ভণ্ড বৈরাগীর কাছে কখনই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তারা কখনই ভগবদ্ভক্তির সুফল লাভ করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব তাদের কাজে সর্বদাই দুর্বোধ্য। কেবল যে সমস্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করছেন, তাঁরাই যথার্থ ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করতে সক্ষম হন।"
– ভক্তিরসামৃতসিন্ধু; অধ্যায় ৩৪, পৃঃ ৩৩১

"প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে আমি শুধু কেবল দেব-দেবী পুজারই সমালোচনা করছিনা, –কৃষ্ণের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের পরম পন্থা থেকে যা কিছ হীনতর, সবকিছুরই সমালোচনা করছি। আমার গুরুমহারাজ কখনো আপস করেননি, আর আমিও কখনো আপস করবো না; ঠিক সেরকম আমার শিষ্যবৃন্দের কেউই যেন কখনও আপস না করে" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৯-১-৭২)।

অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রদান।
মহাজনপত সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥
(চৈঃ ভাঃ)

সাধুসঙ্গ কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥
'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব' আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/৯৩-৯৫)

দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১৯২-৯)

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান

"প্রভুপাদ"– এই অত্যন্ত সম্মানসূচক অভিধাটি কেবল সেই সব সুমহান বৈষ্ণব গুরুবর্গের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁরা পারমার্থিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বা বিশ্বে প্রচারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রমুখ মহান আচার্যের নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য। যখন ইসকনের সদস্যগণ "শ্রীল প্রভুপাদ" কথাটি বলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ -কে বোঝান, কারণ সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-জগতের ইতিহাসে তিনি এক তুলনারহিত স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১-৫-১১) ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত "এই জগতের উদ্ভ্রান্ত মানুষের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করবে।" তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে ব্যাসদেবের এই বিবৃতি অবশ্যই শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রতি প্রযোজ্য। ব্যাসদেব তার শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পাঁচ হাজার বছর পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য রচনা করেছেন, যা অচিরেই জড়বাদের অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত সমগ্র মানবসমাজের পারমার্থিক চেতনার বৈপ্লবিক পুর্নজাগরণ ঘটাবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর দিব্য নাম সারা পৃথিবীর প্রতিনগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। মহান বৈষ্ণব আচার্যগণও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে কলিযুগের প্রগাঢ় আঁধারের মধ্যেও কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার দশ হাজার বছর স্থায়ী উজ্জ্বল এক স্বর্ণ যুগের সূচনা করবে। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে গ্রন্থকার লোচন দাস ঠাকুরও পূর্বাভাস দিয়েছেলেন যে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করার জন্য একজন 'সেনাপতি' ভক্তের আবির্ভাব হবে। সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের সেই বিশেষ গোপনীয় কাজটির ভার কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীপ্রভুপাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

চৈতন্য চরিতামৃতে দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, যদি কৃষ্ণকর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে তিনি কখনই মানুষের অন্তরে কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করতে পারেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে আর্বির্ভূত একজন মহান বৈষ্ণব আচার্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "খুব শীঘ্রই একজন মহান পুরুষের আর্বির্ভাব হবে, যিনি সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করবেন।" স্পষ্টতঃই সেই ব্যক্তি হচ্ছেন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, একজন বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার স্তর অনুধাবন করা যেতে পারে কতসংখ্যক অভক্ত মানুষকে তিনি বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করতে পারেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে। একজন খুব উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকেও কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করানো খুবই দুরূহ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ প্রদত্ত শক্তিতে এমনই শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভাবনাশূন্য মানুষের কাছে গিয়েছিলেন – পাশ্চাত্যদেশের ভোগবাদী যুবসম্প্রদায় – অথচ তাদেরই সহস্র সহস্রকে তিনি ভক্তে পরিণত করেছেন। কেউই শ্রীল প্রভুপাদের এই অসাধারণ কর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ নয়। একাকী তিনি গিয়েছিলেন সেইসব জনসাধারণের মধ্যে যাদের কোন বৈদিক-সংস্কৃতি-সদাচারের ধারণামাত্র ছিল না ; তারা এমন একটি সমাজে বেড়ে উঠেছিল যে-সমাজ প্রবলভাবে মাংসাহার, অবাধ যৌনাচার, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদকাসক্তিতে প্রমত্ত। এমনকি, একজন সাধুর সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাও তাদের ছিল না। পারমার্থিক জীবনচর্যায় প্রবেশ করার জন্য তাঁরা ছিল একেবারেই অযোগ্য।

তাদের কাছে কেবল যাওয়াই নয়, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁদের অনেককে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁরা প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং প্রচারক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন এবং তাঁরা অন্যদেরকেও কৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদানে সমর্থ।

ভারতে বহু বৈষ্ণব ছিলেন যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, বৈরাগ্যবান এবং নিষ্ঠপরায়ণ। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য কেবল শ্রীল প্রভুপাদই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণের দিব্যনামে, তাঁর গুরুমহারাজের আদেশে এবং ভগবান চৈতন্যদেবের শিক্ষায় কেবল তাঁরাই পর্যান্ত

বিশ্বাস ছিল। তাঁর সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি ভারতের বাইরে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য গুরুতর প্রয়াস করেছিলেন। ভগবান চৈতন্যদেবের বাণী যাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার মত যথেষ্ট করুণা ও দূরদৃষ্টি কেবল তাঁরই ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সর্বোচ্চ অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে কেবলমাত্র যেকোন একজনের এইরকম এক অসাধারণ কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাই তাঁর অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্য বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

আধুনিক বিশ্বের পক্ষে উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে বাস্তবসম্মত, সরল ও অকৃত্রিমরূপে উপস্থাপন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষাসমূহকে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেননি বা এক্ষেত্রে কোনরকম আপস করেননি ; কিন্তু তা না করেও, এর গূঢ় সত্যসমূহকে তিনি এমন সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করেছেন যে একজন সাধারণ লোক এবং একজন বিদ্বান – উভয়েই তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই ইসকনের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। তিনি স্বয়ং কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেছেন, যা ইসকনের অব্যহত প্রসারের ভিত্তি। মূলতঃ সেই কার্যপ্রণালী হল ঃ অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও বিতরণ, বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ গুরুকূলসমূহ, বিজ্ঞানীদের এবং বিদ্বৎসমাজের কাছে প্রচার ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভক্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজে বিস্তারিত নির্দেশ দান করেছেনঃ কিভাবে বিগ্রহসেবা করতে হবে, কিভাবে ভজন করতে হবে, কেমন করে প্রচার করতে হবে, কৃষ্ণের জন্য কেমন করে রান্না করতে হবে, কিভাবে মন্ত্র জপ-কীর্তন করতে হবে– এরকম সবকিছু। সেইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। আমাদের ইসকনে সে নীতিনিয়ম, শিক্ষা-বিধি অনুসৃত হয়, তা তাঁর কাছ থেকেই লব্ধ। সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই ইসকনের প্রধান শিক্ষাগুরু ও আচার্য হিসাবে বিদ্যমান থাকবেন।

কৃষ্ণভক্তি লাভের বিভিন্ন পন্থা শাস্ত্র ও বৈষ্ণব ধারায় রয়েছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামীগণ তাঁর প্রদর্শিত পন্থাতেই কৃষ্ণভাবনামৃত অবলম্বন করে থাকেন– এই জেনে যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেব এবং পূর্বতন আচার্যদের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে আধুনিক কালের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভূতপূর্ব সাফল্যই একটি প্রমাণ যে তাঁর প্রচার-প্রচেষ্টা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত, পরিচালিত এবং তাঁর কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এমন কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যা দীক্ষিত ভক্তদের মেনে চলা অত্যন্ত আবশ্যিক– যদি তাঁরা নিজেদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচয় দিতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে দীক্ষিত ভক্তরা ভোর চারটেয় উঠবে, মঙ্গল আরতিতে যোগদেবে, প্রতিদিন অন্ততঃ ১৬ মালা মহামন্ত্র জপ করবে এবং চারটি বিধিনিয়ম দৃঢ়নিষ্ঠার সংগে পালন করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ এইরকম সমস্ত বিধিনিয়মের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছিলেন এবং এগুলিই ইসকনে অনুসরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের একজন যথার্থ অনুগামী ভক্ত হতে হলে তাঁকে অবশ্যই এইসব বিধিনিয়ম পালন করতে হবে। এরকম একজন একনিষ্ঠ ভক্ত প্রভুপাদ-প্রদত্ত বিধিনিয়ম এবং কার্যসূচীর ব্যাখ্যা দিতে বা পরিবর্তন করতে চান না, বিনা প্রশ্নে তিনি সেগুলিকে গ্রহণ করেন; কেননা, তিনি জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের যা দিয়েছেন তা সমগ্র মানব সমাজের পারমার্থিক জাগরণ ঘটানোর জন্য সম্পূর্ণ নির্খুঁত, ও কোনরূপ দোষ-ত্রুটি-সীমাবদ্ধতা-বিহীন পন্থা–শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, আগামী দশ হাজার বছরের জন্য।

গুরুদেব এবং দীক্ষা

কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কখনই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কিছু নয়। এটি এমন একটি পথ যেখানে নিশ্চিতভাবেই রয়েছে নানারকম পরীক্ষা, বাধা-বিপত্তি; কেউই একক প্রচেষ্টায় ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ নয়। সেইজন্য সমস্ত শাস্ত্রেই দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যথার্থ পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে হলে একজন প্রকৃত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুদেব পথনির্দেশ দান করেন। এরকম পথনির্দেশ দানের জন্য গুরুদেবকে অবশ্যই একজন দোষত্রুটিবিহীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ হওয়া প্রয়োজন। না হলে কেমন করে তিনি পথ দেখাবেন? গুরুদেবের আদেশ শিষ্য কখনই অমান্য করতে পারে না। সেইজন্য এমন একজন সদ্‌গুরু নির্বাচন করতে হবে, যাঁর আদেশ কখনও শিষ্যকে ভ্রান্তপথে চালিত করবে না। মনে করুন, আপনি কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে সদ্‌গুরু হিসাবে গ্রহণ করলেন, আর তিনি আপনাকে ভুলপথে পরিচালিত করলেন। তাহলে এভাবে আপনার পুরোজীবনটাই ব্যর্থ হবে। তাই এমন একজন সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হবে যাঁর সহায়তায় জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্ভব হবে। সেটাই হল গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি। এটা কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র নয়। শিষ্য এবং গুরুদেব- উভয়ের পক্ষেই এটি একটি বিরাট দায়িত্ব" (সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী রচিত Srila Prabhupada Lilamrita, Volume-2)।

বর্তমানে ইসকনের অন্তর্গত শ্রীল প্রভুপাদের যে সমস্ত সেবারত শিষ্যবর্গ সংঘের নিয়মাদর্শ অনুসারে দীক্ষা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নিজ পছন্দমত কারও সান্নিধ্যলাভ করে দীক্ষা প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

অবশ্য গুরুনির্বাচনের পূর্বে দেখতে হবে-বিধিনিয়মাদি পালন, মহামন্ত্র জপ, ভোরে ওঠা এবং মন্দির কার্যক্রম সমূহে যোগদান, ভক্তিচর্চায় দৃঢ়নিষ্ঠা, কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রতি দার্শনিক আনুগত্য এবং জি বি. সি অনুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে কার্যরত থাকা- ইত্যাদির একটি ভাল পূর্ব ইতিহাস সেই গুরুদেবের যেন থাকে।

হরিভক্তিবিলাস অনুসারে, দীক্ষাপ্রার্থীকে অন্ততঃ এক বছর কোন স্বীকৃত দীক্ষাদানক্ষম বৈষ্ণবের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে ভগবদ্বিষয় শ্রবণ করতে হবে। এই সময় শিষ্যকর্তৃক সেবাচর্চা ও প্রশ্নজিজ্ঞাসার মাধ্যমে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে। তারপর শিষ্যের অন্তরে যদি এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, "ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, আমি যাঁর শরণাগত হতে পারি, আর যিনি আমায় কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেতে পারেন," তাহলে শিষ্যটি এই বৈষ্ণবের আশ্রয়লাভ ও শেষে দীক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারে। বর্তমানে জি.বি.সি-নির্ধারিত দীক্ষাদানের যে পদ্ধতি রয়েছে, তা যেমন শাস্ত্রানুগ, তেমনি একটি বিশাল সংগঠনের জন্য উপযোগী; কারণ সংগঠনের গুরুবৃন্দ প্রায়ই ভ্রমণরত থাকেন এবং তাঁদের দায়িত্বের ক্ষেত্রও অত্যন্ত বিস্তৃত। কোনরূপ ব্যস্ততা-তাড়াহুড়ো করে দীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে শাস্ত্রসমূহে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য গুরুদেব এবং শিষ্য উভয়ের সুরক্ষার জন্যই এ-বিষয়ে ইসকনে নির্দিষ্ট বিধি-নিয়মের নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে।

ভক্তদের সংস্পর্শে আসার পর কেউ যখন নিজে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহন করার জন্য অনুপ্রাণিত হন, তখন তাঁকে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত ইসকন সদস্যদের কাছে শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন প্রধান শিক্ষাগুরু এবং আচার্য। সেজন্য গুরু হিসাবে তাঁকে পূজা করার জন্য নবীন ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং ভোগ নিবেদনের সময় ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

অন্ততঃ ছয়মাস সর্বনিম্ন মান অনুসারে (প্রতিদিন ১৬ মালা জপ এবং চারটি বিধিনিয়ম পালন) কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পর নবীন ভক্ত ইসকনের কোন দীক্ষাদানকারী গুরুদেবের কাছে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আশ্রয়লাভের জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানাতে পারেন।

গুরুদেবের সান্নিধ্যলাভের প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয়; জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সমীপবর্তী হতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং অভিজ্ঞ ভক্তদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একজন যথার্থ সদ্‌গুরু কেমন হওয়া উচিত– সে সম্বন্ধে পূর্বে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

যে কৃষ্ণভক্তকে গুরুরূপে বরণ করা হচ্ছে, শিষ্যের যেন প্রকৃতই এই অনুভূতি হয় যে সে ওই বৈষ্ণবের দ্বারা দিব্য অনুপ্রেরণা লাভ করছে। শিষ্যটি যেন দৃঢ়বিশ্বাস সম্পন্ন হয় যে, "এই বৈষ্ণব শ্রীল প্রভুপাদের একজন অত্যন্ত একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অনুসারী এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষানির্দেশ অনুসারে ইনি আমাকে পরিচালিত করবেন।"

যখন একজন দীক্ষাদানক্ষম গুরুর প্রতি এরকম আস্থা ও বিশ্বাস শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতই গড়ে ওঠে, তখন শিষ্যটি তাঁর আশ্রয়লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে। যদি শিষ্য অনুভব করে সে তার একটু সময় নেওয়া দরকার তাহলে সে প্রয়োজনমত অপেক্ষার পর দীক্ষার জন্য গুরুর নিকট যেতে পারে। ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নেই। এমন হতে পারে যে, একজনকে গুরুহিসাবে গ্রহণ করাটা সেই শিষ্যের বহু বহু জন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যাঁকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করা হোক না কেন, তিনি সেই একই নিয়ম নির্দেশ দান করবেন যা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন (যেমন ভোরে ওঠা, ১৬ মালা জপ করা– ইত্যাদি)। গুরুদেব হচ্ছেন পরম্পরা ধারার ব্যক্তিক যোগসূত্রস্বরূপ, এবং যাঁরা শিষ্যত্ব লাভ করতে চায় তাঁদেরকে গুরুগ্রহণের বিষয়ে খুব গভীরভাবে বিচার-বুদ্ধিশীল হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে তারা অভিজ্ঞ ভক্তদের কাজ থেকে পরামর্শ নিতে পারে, তবু তাদের কর্তব্য হল দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে নিজেরাই গুরুদেবকে যাচাই করে নেওয়া।

গুরু নির্বাচনের জন্য উপরোক্ত নির্দেশাবলী ছাড়াও, এটা দেখতে হবে যে ভাবী গুরুদেব কতখানি "ষড়বেগ' দমনে সমর্থ হয়েছেন, কি পরিমাণে 'ছটি অনুকুল গুণ' বিকশিত করেছেন এবং কতটা "ষড় দোষ' থেকে মুক্ত হয়েছেন (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য শ্রীউপদেশামৃত, শ্লোক ৬-৩ দেখুন)।

আদর্শগতভাবে, গুরুদেবকে হতে হবে শাস্ত্রজ্ঞ এবং বৈরাগ্যবান। এমনকি যদিও তিনি সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে সমর্থ, তবুও জাগতিক আরাম-বিলাস বা ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি আসক্ত হবেন না।

এছাড়াও, গুরুদেব কতখানি ভক্তিমূলক সেবাচর্চায় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন সেটাও শিষ্যকে দেখতে হবে। অবশ্য প্রচুর যশ-প্রতিষ্ঠা এবং বহুসংখ্যক অনুগামীই যে সবসময় গুরুদেবের উচ্চস্তরের পারমার্থিক যোগ্যতার পরিচায়ক, তা নয়।

তত্ত্বগতভাবে, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক খুব অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য, জীবনের পূজ্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ কাউকে যখন গুরুরূপে নির্বাচন করতে হয়, তখন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতেই তা করতে হয়। যদিও সকল সদ্‌গুরুবৃন্দের শিক্ষা মূলতঃ অভিন্ন, তবু প্রত্যেক গুরুদেবের কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন কিছু গুরুদেব রয়েছেন যাঁরা স্বল্পসংখ্যক শিষ্যগ্রহণ করেন এবং তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদান করেন; আবার কিছু গুরুদেব বহু শিষ্য গ্রহণ করেন এবং অভিজ্ঞ প্রবীণ ভক্তদের কাছে এসব শিষ্যদের শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

কোন বিশেষ গুরুদেবের অতিআগ্রহী শিষ্যদের চাপে পড়ে তাদের গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সেটা কোন সঠিক পদ্ধতি নয়। পারমার্থিক আশ্রয়লাভের জন্য যাঁরা ইসকনে আসেন, তাঁরা ইসকনের যেকোন শিষ্যগ্রহণের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যকে দীক্ষা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে একজন গুরুদেবের নিকট আশ্রয়গ্রহণের পর ভক্ত পূর্বের মতই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে থাকেন। অবশ্য এখন ঐ ভক্ত তাঁর আশ্রয়দাতা গুরুদেব এবং শ্রীল প্রভুপাদ– উভয়কেই গুরু হিসাবে পূজা করতে থাকে। ভক্ত গুরুপ্রণাম এবং কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের সময় এখন তাঁর নিজগুরুর প্রণাম মন্ত্র (যদি থাকে) কীর্তন করবেন। যদিও তিনি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হন নি, তবু তিনি একজন বিশেষ গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করেছেন এবং সেইভাবে তাঁকে সম্মান জানাতে শুরু করবেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে কোন গুরুদেবের কাছে আশ্রয়গ্রহণের অন্ততঃ ছ'মাস পরে ভক্ত তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ইসকনে, গুরুদেব কোন ভক্তকে দীক্ষাদানের পূর্বে, যে মন্দিরে ভক্তটি সেবা কাজ করছে সেই মন্দিরের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অবশ্যই একটি সুপারিশ পত্র নেন। সুপারিশটি করা হয় এইসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করেঃ (১) মন্দিরের অধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত লিখিত এবং মৌখিক– উভয় পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হওয়া (যাতে বোঝা যায় যে ভক্তটি শিষ্য হবার অর্থ অবগত এবং এছাড়া অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বিষয়) এবং (২) মন্দিরের অধ্যক্ষ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সত্যতা যাচাই ঃ শিষ্যটি অন্ততঃ প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করছেন কিনা এবং চারটি বিধি নিয়ম পাল করছেন কিনা; আর সারাজীবন ধরে কঠোরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের প্রয়োজনীয় সংকল্প-বল শিষ্যটির আছে কিনা।

দীক্ষা প্রদানকালে গুরুদেব শিষ্যকে একটি আধ্যাত্মিক নাম দান করেন যদি শিষ্য অন্ততঃ আরো ছ'মাস একনিষ্ঠভাবে ভক্তিসেবাচর্চা অব্যহত রাখেন, তাহলে তিনি পূর্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে যথাসময়ে ব্রাহ্মণদীক্ষা এবং গায়ত্রীমন্ত্রাদি লাভ করতে পারেন।

যদিও দীক্ষার বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে, তবু অত্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাও অনুমোদন করা হয় নি। সচরাচর যারা চারটি বিধিনিয়ম পালন করেন এবং প্রতিদিন ১৬ মালা মহামন্ত্র জপ করেন (বিশেষ করে যাঁরা মন্দিরের সেবায় পূর্ণসময় নিয়োজিত), তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের এক থেকে দু'বছরের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

দীক্ষাদানকারী গুরুদেব ছাড়াও অন্যান্য ভক্তদের (বিশেষতঃ ইসকনের প্রবীণ ভক্তদের) কাছ থেকে শ্রবণ করা এবং তাঁদের সেবা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা যদিও খুব স্বাভাবিক যে ভক্ত তাঁর নিজ গুরুর প্রতি প্রীতিপরায়ণ হবেন, তবু বৈষ্ণব শিষ্টাচার অনুসারে গুরুভ্রাতাদেরকেও গুরুর মতই সম্মান করতে হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদি পূর্বে এমন কোন ব্যক্তির কাছে দীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যিনি যথার্থ স্বীকৃত বৈষ্ণব নন, তাহলে অপর কোন সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁকে (শাস্ত্রানুসারে)

অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। যাদের এরকম "গুরু" ইতিমধ্যেই রয়েছে, তারা অপরাধের বা শাস্তির ভয়ে প্রায়ই তাদেরকে পরিত্যাগ করতে ভীত হন, কিন্তু সেজন্য তাঁদের উৎকণ্ঠিত হবার কোনই কারণ নেই। গুরুত্যাগের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে যে সতর্কবাণী করা হয়েছে, তা অযোগ্য বা ভণ্ড গুরুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর স্বয়ং শাস্ত্রেই উপযুক্ত কারণে গুরুত্যাগ বিহিত হয়েছে। উপযুক্ত একজন বৈষ্ণবকে গুরুরূপে বরণ করলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যকে পালন ও রক্ষা করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই (এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ৮–২০–১ এ শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য দেখুন)।

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী থেকে ঐ বিষয়ের উপর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, নাম হল– 'দি স্পিরিচুয়াল মাষ্টার এ্যাণ্ড দি ডিসাইপল্', ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ভক্তকে এই গ্রন্থটি সযত্নে পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভজনের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক জীবসত্তাই স্বরূপতঃ কৃষ্ণভাবনাময়। সাধনা হল আমাদের সুপ্ত কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত করার পন্থা। এটিকে একটি শিশুর বিকাশের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। একটি শিশুর মধ্যে হাঁটা, কথা বলা এবং আরো সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তা সুপ্ত, যা সময় এবং শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ বিকশিত হবে।

ভজন বা সাধনা হল সেইসব ভক্তদের জন্য, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প এবং যাঁরা একথা অবগত যে সাধনা ব্যতীত কোন যথার্থ পারমার্থিক জীবন লাভ করা সম্ভব নয়।

ভজন বা সাধনার অর্থ হল "পারমার্থিক অনুশীলন"। ভক্তিযোগ অনুসারে ভজন হল মূলতঃ কৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তন। তা আমাদের কলুষিত হৃদয়কে নির্মল করার জন্য অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং এই শ্রবণ-কীর্তন ধীরে ধীরে আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী করে।

অবশ্য ভজন হওয়া চাই নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সুনিয়মিত। প্রাত্যহিক ভজন আমাদেরকে মায়ার প্রলোবন হতে রক্ষা পেতে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। সাধনায় এরকম নিষ্ঠাপরায়ণ না হলে কৃষ্ণভাবনায় কোন সত্যিকার উন্নতি লাভ প্রায় অসম্ভব। এমন কি আমাদের যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন অনুভব-অনুভূতি থাকেও, ভক্তি অনুশীলন ব্যতীত তা কখনই গভীরতা লাভ করবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর মন্দিরসমূহে ভোরে ও সন্ধ্যায় ভজনের কার্যক্রম প্রবর্তন করেছিলেন। ভোরের কার্যক্রম শুরু হয় অন্ততঃ চারটেয় ওঠার মধ্য দিয়ে। নিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্তদের জন্য ভোরে শয্যাত্যাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সকাল হয়ে যাবার আগের সময়টিই (ব্রাহ্মমূহূর্ত) পরমার্থ সাধনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল।

শয্যাত্যাগের পর, ভক্তগণ স্নান করে এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে মন্দিরে যান। তারপর তাঁরা মঙ্গল আরতি ও তুলসী আরতিতে যোগদান করেন, জপমালায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন। এরপর তাঁরা গুরুপূজায় যোগ দেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন। সকালের কার্যক্রমটি চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দেড় ঘন্টার সান্ধ্য কার্যক্রমে আরতি এবং ভগবদ্গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয় এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা যেন প্রতিদিন প্রায় ছয় ঘন্টা ভজনের জন্য একত্রে সমবেত হয়।

গৃহে বসবাসরত এবং অন্যান্য ব্যস্ত ভক্তদের কাছে ভজনের জন্য এতটা সময় ব্যয় অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। আধুনিক যুগের কলরোল ব্যস্ততা-মুখর জীবনে খুব কম মানুষই তাদের পরিবার প্রতিপালনের বাইরে অন্য কিছু করার সময় পায়। কিন্তু যে-জীবনে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার চেয়ে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই, তা পশুজীবনের থেকে উন্নত কিছু নয়। যথার্থ মানবজীবনে পরমার্থ-অনুশীলনেরই অগ্রাধিকার, দেহরক্ষার জন্য কার্যকলাপ সেখানে গৌণ।

যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন, যাঁরা বুঝতে পেরেছেন– ভগবদ্ভক্তি ছাড়া জীবন অর্থহীন, তাঁরা যেভাবেই হোক, ভজনের জন্য কিছুটা সময় প্রাত্যহিক জীবনে নির্ধারিত রাখবেন।

এজন্য নবীন ভক্তের জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। এমনকি এজন্য কাজ কমাতে এবং আর্থিক উপার্জন হ্রাস করতে হতে পারে, যাতে পারমার্থিক উন্নতিসাধনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। যে-পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মরত, সেক্ষেত্রে স্ত্রীটি তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে গৃহকর্মাদি সুশৃঙ্খলভাবে করলে গৃহে অধ্যাত্ম-চর্চার পথ সুগম হবে।

এমনকি আমরা যদি আমাদের জীবনধারায় এমন বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে সক্ষম নাও হই, আমরা আমাদের হাতে যেটুকু সময় থাকে, তা সদ্ব্যবহার করতে পারি। আধিকাংশ মানুষই তাঁদের মূল্যবান সময় অর্থহীন প্রলাপে ও টিভি দেখার মত বৃথা চপলতায় নষ্ট করে। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য যতটা সম্ভব সময় বাঁচানোই প্রকৃত কল্যাণপ্রদ।

কিভাবে ভজন করতে হবে, এই বইয়ে তা আলোচিত হয়েছে। প্রাত্যহিক কার্যক্রম অধ্যায়টিতে ভজন কার্যক্রমের একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। পাঠকবৃন্দ যদি তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ভক্তিক্রিয়াগুলি সাধ্যানুসারে অভ্যাস করেন, তাহলে জীবনের যে পরমোদ্দেশ্য – শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম লাভ – তা অবশ্য সফল হবে।

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম, তা'রা সব তরে ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফলে হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/২৭৯-২৮১)

কীর্তন

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কহল প্রবঞ্চনার যুগ এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম সমূহ কীর্তন করাই হল মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। এছাড়া আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ নেই" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকম্ নাম্নাম্ কলি কল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

" এই বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট ষোলটি নাম কলিযুগের কল্মষ নাশ করার একমাত্র উপায়। সমস্ত বেদেই ঘোষিত হয়েছে যে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন ব্যতীত অজ্ঞানতা-রূপ মহাসাগর অতিক্রম করার আর কোন উপায় নেই। (কলিসন্তরণ উপনিষদ)।

কলিযুগের যুগধর্ম হল হরির দিব্য নামসমূহ কীর্তন করা। এই কীর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা কখনো অতিরঞ্জিত হয় না– কীর্তনের ফল অসীম। প্রত্যেকেরই উচিত যত বেশি সম্ভব ভগবান শ্রীহরির দিব্যনামসমূহ কীর্তন করা।

কীর্তন করার দুটি পন্থা রয়েছেঃ সরবে– সচরাচর মৃদঙ্গ এবং করতাল সহযোগে (একে বলা হয় কীর্তন) এবং "জপ", অর্থাৎ মৃদুস্বরে, প্রধানতঃ নিজে শোনার মত করে নামোচ্চারণ।

কীর্তন করা খুবই সহজ। একদল ভক্তের মধ্যে একজন কীর্তন পরিচালনা করে। অর্থাৎ ভক্তটি প্রথমে গায়, পরে অন্যরা একই সুরে তার অনুসরণ করে!

কীর্তনের গানগুলি সাধারণতঃ খুবই সহজ-সরল হয়– যাতে সহজে সবাই গাইতে পারে।

মন্ত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মহামন্ত্র ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সরলার্থ হল ঃ "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণের শক্তি (রাধিকা), কৃপাপূর্বক আমায় তোমাদের সেবায় নিয়োজিত কর।" 'হরে' হল কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি হরা (শ্রীমতী রাধারাণী)। 'কৃষ্ণ' এবং 'রাম' হল সর্বাকর্ষক, সর্ব আনন্দের আধার পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য নাম।

কীর্তনের সময় প্রধানতঃ এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে – সেটাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। অবশ্য এই মহামন্ত্রটি কীর্তনের পূর্বে আমাদের উচিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র এবং পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তন করে নেওয়া। পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র হল ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পূর্বে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদগণের কৃপালাভ করার জন্য এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়, আর তাঁদের কৃপা নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ কীর্তনে আমাদের সাহায্য করে।

মহান ভক্তদের দ্বারা রচিত আরও অনেক প্রামাণিক ভজনগীতি রয়েছে, যেগুলি গাওয়া যেতে পারে। এইসব ভজন গীতিগুলি ভগবদ্ভক্তি বিকাশে সাহায্য করে। অন্ততঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈষ্ণব ভজন শিখে নেওয়া ভক্তের পক্ষে ভাল – বিশেষতঃ যে সব গীতিগুলি বি.বি.টি. প্রকাশিত "ভক্তি-গীতি সঞ্চয়ন" বা "নামহট্ট পরিচয়" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জপ

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥'

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই হচ্ছে স্বভাব- যেই তা জপ করে, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়।"
–চৈতন্যচরিতমৃত, আদিলীলা ৭-৮৩

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্তের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা একান্ত আবশ্যিক। এমনকি আমরা যদি অন্যান্য কর্তব্যকর্মে খুব ব্যস্তও থাকি, তাহলেও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখতেই হবে।

জপমালাতে জপ করা সবচেয়ে ভাল, কেননা তাতে সংখ্যা রাখা খুব সহজ। বর্তমান যুগের শক্তিধর দিব্যনাম প্রচারক, ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ দীক্ষিত ভক্তদের অন্ততঃ ১৬ মালা জপ করার বিধান দিয়ে গিয়েছেন।

নবীন কৃষ্ণভক্তদের প্রতিদিন ১৬ মালা জপ প্রথমে হয়ত কঠিন মনে হতে পারে। তাঁরা প্রতিদিন আরো কমসংখ্যায় জপ শুরু করতে পারেন ঃ আট, চার, দুই- অন্ততঃপক্ষে ১ মালা- সাধ্যানুসারে। তারপর ভালভাবে অভ্যস্ত হবার সাথে সাথে জপসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়- যতদিন না প্রতিদিন ১৬ মালা সংখ্যায় না পৌঁছানো যায়।

প্রতিদিন জপের জন্য আপনি যে সংখ্যা স্থির করবেন, সেই সংখ্যাটি কখনো কমাবেন না। এবং দীক্ষা লাভের পর প্রতিদিন ১৬ মালার কম কখনো জপ করবে না।

অবশ্য জপ করার অর্থ কেবল নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা-পূরণমাত্র নয়। সঠিক নিয়মে জপ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। জপ করতে হয় স্পষ্টভাবে, অনুরাগ সহকারে, আর কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে করতে। সেইসাথে জপের সময় উচ্চারিত ভগবানের বিদ্যানামসমূহ শ্রবণে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়।

তুলসী কাঠ দিয়ে তৈরী জপমালাই সবচেয়ে ভাল। নিমকাঠ, বেলকাঠ বা পদ্মফুলের বীজ দিয়ে তৈরী মালাও খুব জনপ্রিয়। জপের সংখ্যা রাখার জন্য মালা ব্যবহার করা হয়। জপমালায় ১০৮ টি গুটিকা রয়েছে; আরেকটি বড় গুটিকা রয়েছে, যাকে বলা হয় 'সুমেরু'।

জপমালাটি ডান হাতে নিয়ে তা বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমাঙ্গলির মধ্যে ধরুন। তর্জনী ব্যবহার করতে নেই, এটি যথেষ্ট পবিত্র নয় বলে মনে করা হয়। সুমেরু গুটিকার পর যে মোটা দিকের গুটিকাগুলি রয়েছে, তার প্রথমটি ধরে জপ শুরু করুন। জপ শুরু করার আগে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপ করে নিন ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

ভগবানের দিব্যমান কীর্তনে অপরাধ হতে পারে- সেই অপরাধগুলি দশপ্রকাশ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অষ্টম অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত-পার্ষদদের নামোচ্চারণ আমাদের নামাপরাধ থেকে মুক্ত করে।

এইবার প্রথম গুটিকা ধরে মহামন্ত্র জপ করুনঃ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ তারপর দ্বিতীয় গুটিকা ধরুন। অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ মহামন্ত্রটি আবার জপ করুন–তারপর পরের গুটিতে যান। এইভাবে প্রতিটি গুটিকায় পূর্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন। ১০৮ বার জপ করার পর আপনি 'সুমেরু গুটিকা'-য় পৌঁছবেন এবং তখন এক মালা (এক 'রাউণ্ড') জপ সম্পূর্ণ হবে। এইবার, 'সুমেরু গুটিকা'টি ডিঙিয়ে না গিয়ে মালাটি থলির মধ্যেই ঘুরিয়ে নিন এবং বিপরীত দিক (এবার সরু দিক) থেকে আবার একবার পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করুন।

জপ করা খুবই সহজ, কিন্তু সর্বোত্তম ফল পেতে হলে যথাযথভাবে জপ করা প্রয়োজন। মন্ত্রগুলি এমনভাবে উচ্চারণ করে জপ করবেন, যেন অন্ততঃ আপনার পাশের লোকটির পক্ষে তা শোনার মত হয়। জপ করার সময় মহামন্ত্র শ্রবণে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। এই মনঃসংযোগই হল মন্ত্রের মাধ্যমে ধ্যান, আর তা আমাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করতে অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন। সদাচঞ্চল মনকে শান্ত করা খুব কঠিন, কিন্তু অন্য কিছুর

চেয়ে অভ্যাসই সবচেয়ে ফলদায়ক। লক্ষ্য রাখবেন, দিব্যনামসমূহ যেন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, যেন প্রতিটি নাম স্বতন্ত্র স্পষ্টভাবে শোনা যায়।

কিছু ভক্ত অসতর্কতাবশতঃ খারাপভাবে জপ করার অভ্যাস করে ফেলে - যেমন ঃ অস্পষ্টভাবে বা ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্রোচ্চারণ, শব্দ বা শব্দাংশ বাদ দেওয়া জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, জপ করতে করতে অন্য কাজ করা, জপের সময় কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করা, বা জপ করতে করতে বই পড়া। আরেকটি খুব সাধারণ ভুল হল কিছু কিছু গুটিকায় পুরো মহামন্ত্র জপ না করে ডিঙিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে ১০৮ বার জপ সম্পূর্ণ না করেই এক মালা পূর্ণ করা। জপের সময় অনুক্ষণ এসব বিষয়ে সতর্ক থাকলে দ্রুত উন্নতি লাভ সম্ভব।
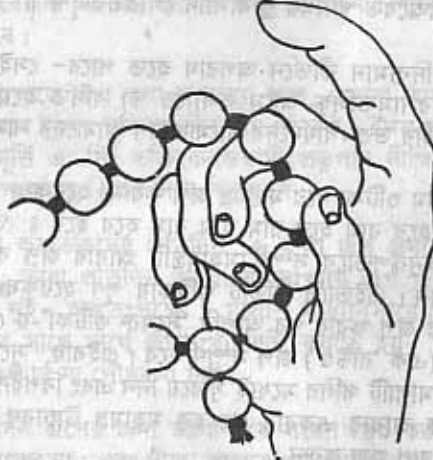
নবীন কৃষ্ণভক্তদের প্রথম প্রথম মালাজপে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে। অভ্যস্ত ভক্তদের ১৬ মালা জপ করতে সাধারণত দেড় থেকে দু'ঘন্টা সময় লাগে (অর্থাৎ প্রতিমালা গড়ে পাঁচ থেকে আট মিনিট)। দ্রুত জপের চেয়ে সঠিক নিয়মে জপ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। সেজন্য প্রথমে স্পষ্টভাবে জপ করুন এবং সুন্দরভাবে নিজ-জপ শ্রবণের প্রতি মনোনিবেশ করুন। যত জপ অভ্যাস করতে থাকবেন, আপনা থেকেই জপের দ্রুততা

বেড়ে যাবে। যদি কেউ পাঁচ মিনিটেই এক মালার বেশী জপ করে, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে এরকম ঃ (ক) ভক্তটি জপে যথাযথরূপে মনোনিবেশ করছে না, (খ) সে মন্ত্রের শব্দ বা শব্দাংশ অসতর্কতাবশতঃ বাদ দিয়ে যাচ্ছে, অথবা (গ) সে কিছু গুটিকা জপ না করে এড়িয়ে যাচ্ছে।

জপের জন্য সর্বোত্তম সময়টি হল ভোরবেলায় ব্রাহ্মমূহুর্তে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বের পবিত্র সময়ে। সর্বাবস্থায় জপ করা যেতে পারে- কর্মস্থলে যাবার সময় ট্রেনে বা রাস্তায় হাঁটার সময়েও। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হবে পূর্ণ মনোযোগে আমাদের দৈনন্দিন বাঁধাধরা কাজকর্ম শুরু করার আগে ভোরবেলাতেই সম্পূর্ণ ১৬ মালা জপ করা।

জপমালাটি বিশেষভাবে তৈরী জপমালার থলির মধ্যে রাখলেই সমচেয়ে ভাল হয়। তর্জনী বাইরে রাখার জন্য মালার থলির মধ্যে একটি বিশেষ ছিদ্র রয়েছে (ছবি দেখুন)। নিয়ে বেড়ানোর সুবিধার জন্য এতে একটি ফিতে থাকে। ভক্তেরা সর্বত্র মালা সঙ্গে নিয়ে চলেন- যাতে যেখানে

হোক সময় পেলেই তারা জপ করতে পারেন। জপ মালা পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ রাখার জন্য সর্বদা যত্ন নিতে হবে। মালার থলি এবং মালা কখনো ছিড়তে নেই বা শৌচাগারে নিতে নেই।

উন্নত ভক্তদের নিকট থেকে ভগবদ্বিষয় শ্রবণ

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

"সকল জীবসত্তার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধপ্রেম নিত্যকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। এমন নয় যে এটি কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। শ্রবণ কীর্তনের প্রভাবে হৃদয় যখন বিশোধিত হয়, তখন সেই সুপ্ত কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়।"

–চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২-১০৭

শাস্ত্রে এরকম বহু শ্লোকে উন্নত ভক্তদের নিকট থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

যারা ইসকন কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি বাস করেন, তারা প্রতিদিন সকালেও সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতার ক্লাসগুলিতে যোগ দেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

এছাড়া, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কয়েকশো রেকর্ড করা ভাষণও ভক্তরা শ্রবণ করতে পারেন। কৃষ্ণের একজন শুদ্ধভক্তের কণ্ঠ থেকে অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ শ্রবণ করার মত কল্যাণকর আর কিছুই থাকতে পারে না (এই সমস্তভাষণ-সহ শ্রীল প্রভুপাদের আরও অনেক ভজন-কীর্তনের ক্যাসেট BBT, Hare Krishna Land, Bombay 400 049 থেকে পাওয়া যাবে। অথবা আপনি আপনার নিকটতম ইসকন কেন্দ্রেও যোগাযোগ করতে পারেন)।

নবীন কৃষ্ণভক্তগণ ব্যক্তিগত পরামর্শের জন্য ইসকনের অভিজ্ঞ ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বিশেষতঃ প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন হয়। বৈষ্ণব ভাবদারা ও আচরণে অভ্যস্ত হতে কিছু ভক্তের পক্ষে প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে। প্রত্যেকের আবার নিজস্ব কিছু সংশয় সন্দেহ, সমস্যা ইত্যাদি থাকে। সেজন্য, লজ্জা না করে

উন্নত ভক্তদের সাহায্য নিতে হয়। তাদের কাজই হল এই ঃ কনিষ্ঠ ভক্তদের সাহায্য করা।

যথার্থ শুদ্ধভক্তদের নিকট থেকে শ্রবণ করলে যেমন হৃদয় নির্মল হয়, তেমনি মায়াবাদী, কপটভক্ত, জড়জাগতিক পন্ডিত, পেশাদার ভাগবত পাঠক এবং অন্যান্য শ্রেণীর অভক্তদের কাচ থেকে শ্রবণ করলে চিত্ত কলুষিত হয়। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে তাদের কথাকে 'সর্পের জিহবা-স্পৃষ্ঠ দুধের' সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুধ খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর, কিন্তু একটি সাপ যদি সেই দুধ পান করে, তবে তা বিষে পরিণত হয়। এটি দেখতে একরকম মনে হতে পারে, এমন কি স্বাদেও এক থাকতে পারে, কিন্ত ওই দুধ এখন বিষ। ঠিক তেমনি কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাষণ, নাটক, সংগীতাদিও যদি যথার্থ শুদ্ধভক্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে তা আমাদের পারমার্থিক জীবনে চরম সর্বনাশের সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ভক্তদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

সর্বদেশ কাল দশায় জনের কর্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ / ১২২)

অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী পাঠ

পাঠ হল শ্রবণের একটি অঙ্গবিশেষ; এই পন্থায় একজন অপরজনের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অত্যন্ত মূল্যবান সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত হয়েছে। যদিও শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি হতে আমরা এখন বঞ্চিত, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই তাঁর অপ্রাকৃত গ্রন্থগুলি পাঠের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। বৈষ্ণব দর্শনের সুক্ষ্মতত্ত্ব-সমুহকে আধুনিক মানুষের কাছে সহজযোগ্য করে প্রাঞ্জলভাবে ইংরেজী ভাষায় তিনি উপস্থাপন করেছেন। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন বিশেষভাবে কৃষ্ণকৃপাশক্তিপ্রাপ্ত।

কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণালাভ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি পাঠ করা। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার পন্থা অবগত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই শ্রীল প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থাবলীতে রয়েছে।

শ্রীলপ্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, যে-সমস্ত গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলঃ ভগবদ্গীতা যথাযথ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সবই বাংলায় পুনরনুদিত হয়েছে)। এগুলি গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

কৃষ্ণভানামৃতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী এই সমস্ত প্রারম্ভিক গ্রন্থগুলি দিয়ে অপ্রাকৃত সাহিত্যপাঠ শুরু করতে পারেন ঃ কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার, হরে কৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ, আদর্শ প্রশ্ন এবং আদর্শ উত্তর, লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, এবং আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা। সর্বস্তরের ভক্তের জন্য আরেকটি চমৎকার গ্রন্থহল সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী রচিত শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত (শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী)। পূর্ণ ছয় খন্ডের জীবনী (ইংরেজী) বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (বাংলা)-দুটিতেই খুব সহজ-সরলভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্বকে একজন শুদ্ধভক্তের অত্যন্ত সুপাঠ্য জীবনকাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভক্ত যখন আরেকটু গভীর গ্রন্থ পাঠের জন্য প্রস্তুত হন, তখন প্রথমে তাঁর এই গ্রন্থগুলি পাঠ করা উচিত ঃ ভগবদ্গীতা যথাযথ, ঈশোপনিষদ, কপিলশিক্ষামৃত এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ভগবদ্গীতা অন্ততঃ দুবার পুরোপুরি পাঠ করলে সবচেয়ে ভাল হবে। এরপর তাঁকে পাঠ করতে হবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদ এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "মানব সমাজে আমাদের সর্বোত্তম অবদান"।

এরপর শ্রীমদ্ভাগবতম পাঠ করুন। দ্বাদশস্কন্ধ-বিশিষ্ট ভাগবত অনেকগুলি খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ভক্তি, অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং বৈদিক সংস্কৃতির এক অমূল্য ভান্ডার-স্বরূপ – যেন এক অপূর্ব পারমার্থিক বিশ্বকোষ। গ্রন্থটি প্রথম থেকে পাঠ করতে হয়, এবং প্রতিদিন অল্প করে নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমগ্র গ্রন্থটি সমাপন করা উচিত। এরপর পাঠ করুন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত–এটিও একটি বহুখন্ড বিশিষ্ট গ্রন্থ যাতে বিশদে ও আনন্দদায়কভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনবদ্য লীলা ও দর্শনতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতম বা অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠের সময়েও প্রতিদিন ভগবদ্গীতা যথাযথ অন্ততঃ অল্প করেও পাঠ করা খুব ভাল। আরও অনেক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী রয়েছে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত চিন্ময় গ্রন্থাবলীই আজকের যুগে সবচেয়ে উপযোগী।

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এই সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যসমূহ পাঠ করা সকল ভক্তবৃন্দের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। দু'ঘন্টা বা এক ঘন্টা অথবা অন্ততঃ আধঘন্টা প্রতিদিন পাঠ করুন। অন্যসব ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনের মতই গ্রন্থপাঠও করা উচিত গভীর মনোযোগে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে। পাঠের সময় গুরুদেব এবং কৃষ্ণের কাছে শাস্ত্রের সুমহান বিষয়গুলি উপলব্ধি করার জন্য কৃপা প্রার্থনা করতে হয়। যেসব সৌভাগ্যবান মানুষের এইসব অমৃতময় চিন্ময় সাহিত্যসম্ভার পাঠের প্রতি আসক্তি জন্মে, তারা কখনো জড়বিষয়াসক্ত লেখকদের পূঁতিগন্ধময় আবর্জনাস্বরূপ জড়ীয় সাহিত্যে আকৃষ্ট হয় না। তাদের জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমল প্রেম-সঞ্জাত আনন্দ-স্বাদ দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে।

ইসকনের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ	ঈশোপনিষদ
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (সপ্ত খন্ড)	গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত (১ থেকে ১০ স্কন্ধ)	ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা	আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ	বৈদিক সাম্যবাদ
শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত	আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
জীবন আসে জীবন থেকে	কৃষ্ণভাবনার অমৃত
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু	ভক্তি কথা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	জ্ঞান কথা
কপিল শিক্ষামৃত	ভগবানের কথা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা	ভক্তি রত্নাবলী
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সূচনা	বুদ্ধিযোগ
কৃষ্ণভাবনার অনুপম উপহার	ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
উপদেশামৃত	অমৃতের সন্ধানে
কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা	বৈষ্ণব কে ?
হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার	কুন্তীদেবীর শিক্ষা
(পাক্ষিক, শ্রীমায়াপুর)	ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)

ঃ গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করার যাবতীয় ঠিকানা ঃ
সংকীর্তন প্রচার বাস, ইসকনের যে কোন মন্দির, প্রকাশনী সংস্থা ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট (কলিকাতা, শ্রীমায়াপুর)

ভক্তসঙ্গ

শাস্ত্রসমূহে পুনঃপুন সাধুসঙ্গ করার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। শুদ্ধভক্ত সঙ্গ-প্রভাবেই ভক্তি পুষ্টিলাভ করে ও বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন ঃ

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

"কৃষ্ণভক্তির মূল কারণ সাধুসঙ্গ। এমনকি যখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন।"

–চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২-৮৩

শুদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গ করার দুটি প্রাথমিক পন্থা হল ঃ তাদের নিকট থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা এবং তাদের সেবা করা। যেসব ভক্ত ইসকনে থাকেন, বা কোন ইসকন কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকেন, তারা সহজেই এই সুযোগ লাভ করতে পারেন। সর্বদা সেইসব ভক্তদের সঙ্গ করার চেষ্টা করুন, যারা কৃষ্ণভক্তিতে সদাতৎপর ও গভীরভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ।

যাঁরা ইসকন কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে থাকেন, তাঁরা যত ঘন ঘন সম্ভব সেসব কেন্দ্রে দিয়ে ভক্তসঙ্গ করতে পারেন। তাঁরা ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে পত্রবিনিময়ও করতে পারেন। এ–ব্যাপারটি সর্বদা হৃদয়ে জানতে হবে যে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং তাঁর সেবা করে (বিশেষতঃ তাঁর গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে) শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করা যায়। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা তাঁর ভক্ত অনুগামীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন; শ্রীল প্রভুপাদের সাহচর্য লাভে ধন্য তাঁর সেইসব শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সঙ্গলাভে আমাদের কখনই অবহেলা করা উচিত নয়।

এমন হতেই পারে যে, কৃষ্ণভক্তিতে আকৃষ্ট এমন অনেকে আপনার কাছাকাছিই রয়েছে, কিন্তু আপনি তাদের কথা জানেন না। যদি তেমন হয়, সম্ভবতঃ আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রের ভক্তরা তা জানেন, এবং তারা আপনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আপনি তাদের নিয়ে কীর্তন, আলোচনা উৎসবাদি-সহ অন্যান্য কার্যক্রম অনুষ্ঠান করতে পারেন। আপনি যদি আপনার এলাকায় শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করেন, তাহলে এটা প্রায় নিশ্চিত যে ঘটনাক্রমে আপনি এমন কারও দেখা পাবেন যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী। সেজন্য, যদি আপনি কোন সঙ্গ না পান, তাহলে অবিলম্বে গ্রন্থবিতরণে বেরিয়ে পড়ুন, নিশ্চয়ই কাউকে পেয়ে যাবেন!

বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে গৃহীরা সন্ন্যাসী এবং সাধু-ভক্ত-ব্রাহ্মণদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে থাকেন। তারা গৃহে আগত সাধু বৈষ্ণবকে উত্তম প্রসাদ ভোজন করান, তাঁদের নিকট থেকে ভগবৎ কথা শ্রবণ করেন ও সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাঁদের সঙ্গে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করেন এবং সর্বোপায়ে তাদের সেবা করেন। এই ধরণের সাধুসঙ্গ খুব আনন্দদায়ক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই তা অত্যন্ত কল্যাণকর।

চারটি বিধিনিয়ম

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের জন্য চারটি বিধিনিয়ম হল ঃ

১। মাছ-মাংস-ডিম সহ সবরকম আমিষ আহার বর্জন।

২। সর্ববিধ মাদকদ্রব্য বর্জন।

৩। তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি সর্ববিধ দ্যুতক্রীড়া পরিত্যাগ।

৪। অবৈধ যৌনকর্ম বর্জন।

এই চারধরণের পাপকর্ম হল পাপময় জীবনের চারটি স্তম্ভের মত, তাই এসব অবশ্য বর্জনীয়। এসব পাপাচার সরাসরি ধর্মের চারটি স্তম্ভকে ধ্বংস করে – সেগুলি হল ঃ দয়া, সংযম, সত্যবাদিতা এবং শুচিতা।

যদি কেউ পাপকর্মে আসক্ত থাকে এবং তার যদি দয়া, সংযম সত্যাবাদিতা এবং শুচিতা ইত্যাদি না থাকে, তাহলে কেমন করে সে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করবে? সেইজন্য এই চারটি বিধি নিয়ম পালন প্রত্যেক ভক্তের জন্য– বস্তুতঃ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জন্যই আবশ্যিক।

মাছ, মাংস, ডিম ছাড়াও পেঁয়াজ-রসুন আহার করাও ভক্তদের জন্য নিষিদ্ধ, যেমন কারখানায় তৈরী রুটি, বিস্কুট বা অন্যান্য খাবার, যা অভক্তদের দ্বারা তৈরী হয়েছে। ভক্তরা আহারের জন্য কেবল কৃষ্ণপ্রসাদই পছন্দ করেন। ভগবানকে আনন্দদানের জন্য প্রস্তুত এবং প্রীতিসহকারে তাঁকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্যই হল কৃষ্ণপ্রসাদ।

মাদক দ্রব্য বলতে কেবল অ্যালকোহল, গাঁজা এবং আরও সব অতি-উত্তেজক মাদকই নয়, তামাক, পান-সুপারী, নস্যি, সিগারেট, চা, কফি এবং ক্যাফিন রয়েছে এমন ঠাণ্ডা পানীয় (সফ্‌ট্‌ ড্রিংক্স– যেমন কোলা) –ইত্যাদি সমভাবে বর্জনীয়।

তাস-দাবা-জুয়া খেলা সহ সমস্ত ধরণের চপলতাপূর্ণ আমোদ-প্রমোদ– যেমন টিভি দেখা, সিনেমায় যাওয়া, জড়জাগতিক খেলা-ধূলা, গানবাজনা– এসব ভক্তদের জন্য নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, লটারীও জুয়াখেলা বিশেষ।

বিবাহিত জীবনে কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অপর সমস্ত রকম যৌন সম্বন্ধই অবৈধ। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনরূপ যৌন ক্রিয়াকলাপ, অত্যন্ত পাপজনক, আর তা পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট করে– কাজেই তা এমনকি চিন্তা করাও উচিত নয়। ভ্রূণহত্যা, কৃত্রিম গর্ভনিরোধ এবং বন্ধ্যাকরণ শুধু প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক নয়, তা মহাপাপ। স্বমেহনকেও অবৈধ যৌনক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়, কেননা তার ফলে অযথা বীর্যক্ষয় হয় এবং তা আমাদের চেতনাকে কলুষিত করে।

আধুনিক কালের তথাকথিত প্রগতিশীল সভ্যতা এমনভাবে যৌনতাকে অবাধ করে তুলেছে যে, এমনকি যারা পারমার্থিক প্রগতিতে নিষ্ঠাপরায়ণ তাদের পক্ষেও যৌনাবেগ দমন করা অনেকসময় দুরূহ হয়ে পড়ে। এমন সমস্যা থাকলে, আপনি গভীর বিশ্বাস রাখেন এমন কোন ভক্তের

সাথে এই নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন। এছাড়াও বর্তমান লেখক রচিত– 'Brahmacharya in Krishna Consciousness' (বিবিটি তে পাওয়া যাবে) বইটি পড়তে পারেন।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষাণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মণি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥
(ভাঃ ৩/২৫/২৫)

গৃহে মন্দির প্রতিষ্ঠা

যে সমস্ত ভক্ত গৃহী, বিশেষতঃ যারা ইসকন মন্দির হতে দূরে বাস করেন, তাদের জন্য গৃহে মন্দির প্রতিষ্ঠা একটি অপরিহার্য কাজ। গৃহে মন্দির স্থাপন করা হলে এবং এই মন্দিরকে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু রূপে গড়ে তোলা হলে একটি সাধারণ গৃহকে এক দিব্য স্থানে পরিণত করে।

যাদের যথেষ্ট স্থান ও সঙ্গতি আছে, তারা সাধারণতঃ পৃথকভাবে মন্দির তৈরী করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ গৃহীভক্তরাই তাদের গৃহসংলগ্ন একটি কক্ষকে মন্দির-কক্ষ বা পূজার ঘরের জন্য বেছে নেন। আর যাদের একেবারেই জায়গা কম, তারা তাদের বাসগৃহের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে একটি পূজাবেদী স্থাপন করে নিতে পারেন।

মন্দির-কক্ষটি এমন একটি স্থান যেখানে পরিবারের সদস্যগণ কীর্তন, আরতি এবং শাস্ত্রপাঠের জন্য একত্রিত হয়; যেখানে খাদ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়, এবং পরিবারের সদস্যদের যে-কেউ ব্যক্তিগতভাবে জপ করতে, শাস্ত্রপাঠ করতে এবং কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে সেখানে আসতে পারে।

এজন্য পৃথক একটি ঘর হলে সবচেয়ে ভাল হয়, কেননা তাহলে ঘরটিতে পবিত্র পরিবেশ বজায় রাখা সহজ হয়। অন্যান্য ঘরগুলি গৃহকর্মাদি, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, বড়দের খোলামেলাভাবে বিশ্রাম নেওয়া– ইত্যাদির কাজে ব্যবহার হয়, আর মন্দির কক্ষটি শুধুমাত্র পরমার্থ-চর্চার জন্য কঠোরভাবে সংরক্ষিত রাখাতে হয়।

মন্দির-কক্ষটি বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠ এবং প্রার্থনা-গৃহ, এই দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। মন্দির কক্ষের শেষ প্রান্তে একটি ভাগে বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠ তৈরী হয়। একটা পর্দার সাহায্যে এটিকে প্রার্থনা গৃহ থেকে পৃথক রাখা হয়। যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে পৃথক কোন মন্দির কক্ষের স্থান সংকুলান হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে বিগ্রহ-সমূহকে একটি পর্দা দ্বারা অন্তরালে রাখতে হয়।

গৃহে ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধভক্তদের আলেখ্য (চিত্র) রূপের পূজা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে যখন ভক্ত পূজা-আরাধনায় খুব অভিজ্ঞ এবং উন্নত হয়ে ওঠেন, তখন মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ যে-সমস্ত গৃহীভক্ত দীক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তারা গৃহে বিগ্রহ আরাধনা করবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

কেবল একজন বৈষ্ণব গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে উন্নত স্তরের বিগ্রহ পূজা অর্চনা শুরু করা কর্তব্য; সেজন্য এরকম অর্চন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এই বইয়ে দেওয়া হয় নি। যদি আরাধক ভক্তের হৃদয়ে যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহলে ভগবানের আলেখ্যরূপ (চিত্র-রূপ) কাষ্ঠ, প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত ভগবদ্বিগ্রহের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নয়। তবে যেহেতু বিগ্রহপূজা খুব জটিল এবং বিস্তৃত, সেজন্য অত্যন্ত অধ্যবসায়শীল নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তরাই কেবল বিগ্রহ পূজার্চনার অনুমোদন লাভ করতে পারেন।

একটি আদর্শ পূজাবেদীতে নিম্নলিখিত আলেখ্যগুলি থাকা উচিত (চিত্র দেখুন ; সংখ্যাগুলি আলেখ্য-সমূহের অবস্থানের ক্রম-সূচক) ঃ

১। সম্প্রদায় আচার্যবর্গ ঃ ক) ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ; (খ) শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ;

গ) শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং (ঘ) শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর (কোন কোন ভক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীগুরুদেব জগন্নাথ দাস বাবাজী-র আলেখ্যও রাখেন)।

২। বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামী (রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং জীব গোস্বামী) ঃ এঁরা হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যবৃন্দ, যাঁরা মহাপ্রভুর নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বসমূহ এবং বৈষ্ণব আচার-বিধি জগতে প্রচার করেছিলেন।
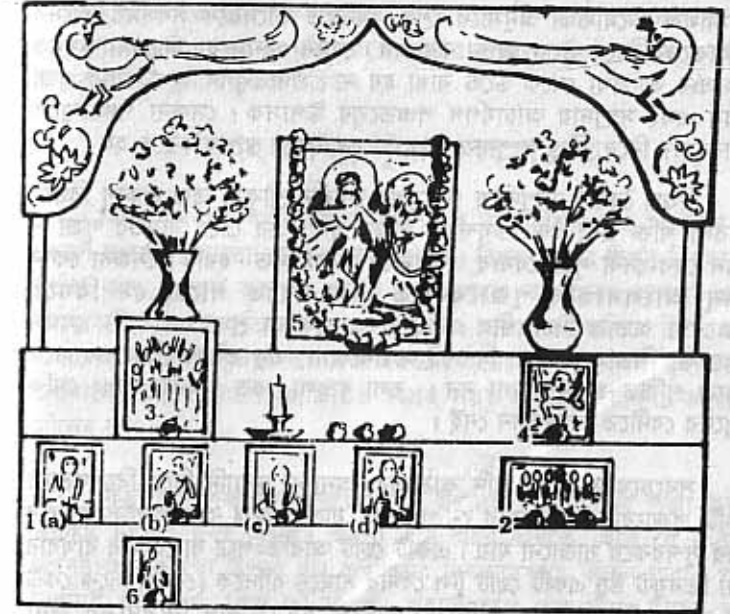
৩। পঞ্চতত্ত্ব (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর চারজন্য পার্ষদ)।

৪। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব ঃ ভক্তগণ ভগবানের এই বিশেষ রূপটির

পূজা করেন এইজন্য – ক) শ্রী নৃসিংহদেব ভক্তদেরকে ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের থেকে এবং নানাবিধ বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা করেন; এই তিমিরাচ্ছন্ন কলিযুগে এই দুই-ই অত্যন্ত প্রবল, এবং খ) ভক্তের অন্তর থেকে আসুরিক চিন্তা-কামনা দূরীভূত করতেও তিনি ভক্তদেরকে বিশেষভাবে কৃপাশক্তি প্রদান করেন।

৫। রাধা-কৃষ্ণ

৬। শ্রীগুরুদেব ঃ দীক্ষাগ্রহণের পর, অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসকনের কোন গুরুদেবের আশ্রয় দেবার পর গুরুদেবের আলেখ্যও বেদীর উপর রাখতে হয়।

এটা গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে, যাঁরা উপাস্যগণের মধ্যে পারমার্থিক ক্রমোচ্চতা অনুসারে শ্রেষ্ঠ, বেদীতে তাঁদেরকে সবসময় তাঁদের উপাসকদের থেকে উচ্চে স্থাপন করা হয়। যেমন গুরুদেবের আলেখ্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য থেকে উচ্চে রাখা হয় না। পঞ্চতত্ত্বগণ রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন এবং সম্প্রদায় আচার্যগণ পঞ্চতত্ত্বের উপাসক। সেজন্য পঞ্চতত্ত্বকে রাধাকৃষ্ণের নিম্নে, কিন্তু সম্প্রদায়-আচার্যগণের উপরে স্থাপন করতে হয়।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রকাশ বিগ্রহ, অন্তরঙ্গা শক্তি এবং শুদ্ধভক্তবৃন্দসহ পূজিত হন। এর চেয়ে ন্যূনতর পূজা – যেমন দেব-দেবী পূজা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অনুমোদিত হয়নি। সেজন্য কোন্ কোন্ আলেখ্যগুলি পূজাবেদীতে রাখা যেতে পারে, সে বিষয়ে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিচারশীল। এছাড়া অন্যান্যসব শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি যেমন দেবদেবী, পিতামাতা–এঁরা নিশ্চয়ই সম্মানযোগ্য, তবু তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে পূজিত হবার যোগ্য নন। বলা বাহুল্য, ভণ্ড অবতার এবং মেকি সাধুদের বেদীতে কোন স্থান নেই।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি কাঠ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে বিশেষভাবে একটি পূজাবেদী তৈরী করে নেওয়া হয়, যাতে সমস্ত আলেখ্যগুলিকে তার উপর সুন্দরকরে সাজানো যায়। একটি ছোট আরতি-পাত্র বা রেকাবি রাখবার জন্য তিনফুট উঁচু একটি ছোট টুল বেদীর সামনে বাঁদিকে (বেদীর দিকে কেউ মুখ করে দাঁড়ালে তার বাঁদিকে) রাখতে হয়। ভোগ নিবেদনের জন্য আরেকটি এক ফুট উঁচু ছোট চৌকি দরকার। পূজার সময় বসার জন্য একটি কুশাসনও প্রয়োজন।

মন্দিরকক্ষ প্রতিদিন ফুল, মালা ইত্যাদি দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজালে ভাল হয়। সুন্দরভাবে পূজার জন্য যত ব্যয় করা যায় ততই ভাল। যাদের অর্থনৈতিক সামর্থ অত্যন্ত কম, তারাও তাদের সাধ্যানুসারে যত সুন্দরভাবে সম্ভব পূজার্চনা করবেন।

মন্দির কক্ষে অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সেগুলির তালিকা রয়েছে। অবশ্য পারিবারিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সব বিধিনিয়ম কার্যকরী করা সম্ভব নয়, তবু যতদুর সম্ভব উচ্চমান বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

মন্দিরকক্ষ এমনই একটি স্থান যেখানে আমরা অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু কৃষ্ণকে ব্যক্তিগতভাবে আসার এবং গৃহে প্রভু হিসাবে বিরাজিত থাকার আমন্ত্রণ জানাই; সেজন্য মন্দিরকক্ষে গভীর শ্রদ্ধাসম্ভ্রমপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত।

বিগ্রহ-সেবা, পূজা এবং আরতি

বিগ্রহ-সেবা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের এক বিশদ অঙ্গ, এখানে তা কেবল সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বিগ্রহ-সেবার বিশদ নিয়মাবলী বর্ণনা করে ইসকন ভক্তগণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এসব নিয়মাবলী এবিষয়ে অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিখে নিতে হয়। এখানে যে সেবা-পূজার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, তা যেসব গৃহীভক্তরা ভগবানের আলেক্ষ্যরূপ (প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নয়) স্বগৃহে আরাধনা করছেন, তাঁদের জন্য।

কিছু ভক্ত পূজার্চনা করতে খুবই উৎসাহী। ভগবানের পূজা করার এরকম উৎসাহ খুবই সুন্দর। অবশ্য এটা স্মরণ রাখতে হবে যে এ-যুগে ভগবদুপলব্ধির মুখ্য উপায় হল ভগবানের দিব্যনামসমূহ কীর্তন করা। পূজা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা ফলপ্রদ করতে হলে তার সাথে কীর্তন করা অবশ্য প্রয়োজন।

হরিভক্তিবিলাস এবং অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের পূজার্চনার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেজন্য নিজ সাধ্যসামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গৃহে পূজা-আরাধনার ব্যসস্থা করা কর্তব্য। এমন নয় যে একটি বিখ্যাত, সমৃদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে গৃহে পূজানুষ্ঠান করতে হবে।

বিগ্রহ সেবার আদর্শ নিয়ম হল স্থায়ীভাবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে কঠোর শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা করা। কিন্তু সকল ভক্ত এরকম দুরূহ পূজার্চনার জন্য প্রস্তুত নন। এরকম পূজা কেবল কঠোর শাস্ত্রানুশাসন পালনে সক্ষম নিষ্ঠাবান ভক্তদের জন্য।

শাস্ত্রে পূজা করার কোন একটি নির্দিষ্ট পন্থা উল্লিখিত হয়নি। এখানে পূজার্চনার যে পন্থা পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সরল এবং সকলের পক্ষেই তা সহজসাধ্য। যেমন, গৃহে নারীরা পূজা করতে পারেন, সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু ভারতের কোন প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে কোন নারী পূজা করছেন – এমনটা ভাবাই যায় না। তবু এই নিয়মটি সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে যে, মাসের যে সময়টি তারা প্রকৃতিগতভাবে অপরিচ্ছন্ন থাকেন, সে-সময় তারা পূজার কর্মে যোগ দেবেন না।

ঠাকুর ঘরের সবকিছু, পূজার জন্য ব্যবহৃত সকল উপকরণ নিখুঁতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিগ্রহ, চিত্রাদি, বেদী-বস্ত্র, শঙ্খ, আরতির সময়ে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড, মেঝে এবং ঠাকুর ঘরের দেওয়াল–সবকিছু নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। বিগ্রহদের পোশাক পুরানো হবার প্রথম চিহ্ন দেখা গেলেই তা বদলাতে হবে। পিতল ও তামার বাসনগুলি সবসময় উজ্জ্বল ঝকঝকে রাখতে হবে। পূজার সময় ব্যবহৃত ফুলগুলি রাত্রেই সরিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভাল।

আরতি বা পূজার আগে (অর্চা বিগ্রহের ক্ষেত্রে রান্নার আগেই) স্নান করতে হয় এবং পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে হয়। বিগ্রহ পুজার ক্ষেত্রে রেশম বস্ত্র সর্বোত্তম। সূতীর বস্ত্রও পরা চলে। উল যদিও পবিত্র, তবু কঠোরভাবে শাস্ত্রানুগ বিগ্রহ অর্চনায় উল বস্ত্রও পরা উচিত নয়। পলিয়েস্টার, টেরিকটন এবং কৃত্রিম বস্ত্র বা সূতী -মিশ্রিত বস্ত্র পরা নিষিদ্ধ। আর, এসময় বৈষ্ণব পোশাক পরা উচিত, পাশ্চাত্যধাচের কোন পোশাকে পূজাদি কর্ম করা অনুচিত।

যদিও বিগ্রহ পূজায় গৃহস্থদের জন্য কিছু বিধিনিয়মের শিথিলতা রয়েছে , তবু গৃহের পূজায় কৃপণতা করা উচিত নয়। যদি একেবারেই বিত্তহীন না হন, তাহলে অন্ততঃপক্ষে সুন্দর ধুপ এবং ফুল পূজার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখুন।

আরতি নিবেদন

কেবল আরতির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট একটি আরতি থালাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রাখতে হবে ঃ

১। বাজানোর জন্য একটি শঙ্খ;

২। বিশুদ্ধ জলপূর্ণ একটি আচমন পাত্র ও একটি চামচ;

৩। ধূপ–অন্ততঃ তিনটি কাঠি;

৪। পঞ্চপ্রদীপ (ঘি দিয়ে পাঁচটি পলতে জ্বালাতে হয়, পরিবর্তে এক পলতে বিশিষ্ট ঘিয়ের প্রদীপও ব্যবহার করা যেতে পারে);

৫। একটি জলশঙ্খ এবং শঙ্খ রাখার ধারক;

৬। জলদানের জন্য একটি পাত্র;

৭। একটি বস্ত্রখণ্ড। সাধারণতঃ রুমাল ব্যবহার করা হয়। কোন লেখা বা ছাপশুন্য সুন্দরভাবে চিত্র-বিচিত্রিত রুমালই সর্বোত্তম। কেবল আরতিতে দানের জন্য এরকম দু'তিনটি রুমাল রাখতে হয়। সেগুলো অবশ্যই খুব সযত্নে ভাঁজ করা এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন।

৮। এক রেকাবি ফুল;

৯। একটি তেলের প্রদীপ বা মোমবাতি;

১০। চামর;

১১। একটি ময়ুর পাখা;

১২। একটি ঘণ্টা।

যে-ভক্ত আরতি করবেন, তিনি প্রথমে ঠাকুর ঘরের বাইরে থেকে বিগ্রহ সমূহকে প্রণাম করবেন। তারপর তিনি এই ভাবে আচমন করবেন ঃ আচমন পাত্র থেকে বাঁ হাতে চামচে জল তুলে ডান হাতে দেবেন, তারপর ঐ জলটা চুমুক দেবেন ও বলবেন "ওঁ কেশবায় নমঃ"। তারপর আরেকটু জল ঐভাবে ডান হাতে নিয়ে পূর্বের মত সেটা দ্বিতীয় বার চুমুক দেবেন ও বলবেন, "ওঁ নারায়ণায় নমঃ"; আর একইভাবে তৃতীয়বার চুমুক দিয়ে বলবেন, "ওঁ মাধবায় নমঃ"। আচমন পাত্রটি সমগ্র আরতি অনুষ্ঠানেই ব্যবহার করতে হবে– হাত এবং আরতির দ্রব্যাদি শুদ্ধকরণের জন্য। কোন দ্রব্যকে শুদ্ধিকরণ করার পদ্ধতিটি খুব সরল; কেবল তিন ফোঁটা জল আচমন পাত্র থেকে নিয়ে তার উপর দিন। কোন দ্রব্য নিবেদন করার পূর্বে প্রতিবার তিন ফোঁটা জল দিয়ে হাতকে শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

আচমন করার পর প্রথমে বাজানোর শঙ্খকে শুদ্ধ করে নিন (এ শঙ্খটি বিগ্রহ প্রকোষ্ঠের বাইরে থাকবে)। তারপর ডানহাত ধরে এটিকে তিনবার বাজান। শঙ্খটিকে আবারও শুদ্ধ করে নিন। নিজের ডান হাতটি পুনরায় শুদ্ধ করুন এবং এবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করুন। ঘরের ভিতরে গিয়ে ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে পর্দার আবরণ উন্মোচন করুন।

পর্দা উন্মোচনের পর শ্রীবিগ্রহসমূহ দর্শনমাত্র সমবেত ভক্তগণ ভূমিতে অবনত হয়ে প্রণাম করবেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুরু করবেন। আরতি পাত্রটি একটি টুল বা চৌকির উপর রাখুন (সেটা এজন্য ঠাকুরঘরে রাখা থাকবে)।এবার ধূপ শুদ্ধ করে নিন (তিন ফোঁটা জল ধূপকাঠির গোড়াতে দিন), তারপর তা জ্বালিয়ে নিন। জ্বালানোর জন্য একটি তৈল প্রদীপ রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়, না হলে একটি মোমবাতি–এগুলো আগেই জ্বালিয়ে নিতে হয়। ঠাকুর ঘরে সর্বক্ষণের জন্য একটি তৈল প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারেন। এসব ব্যবস্থা না হলে সরাসরি দেশলাই দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে নিন।

দুটি হাতই নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ করে নিন, তারপর ঘণ্টাটি ; বাঁ হাতে ঘণ্টা এবং ডান হাতে ধূপ নিন ও তারপর আরতি শুরু করুন। প্রতিটি দ্রব্য আরতিতে নিবেদন করার সময় সর্বক্ষণ ঘণ্টা বাজাতে হয়।

আরতির সময়ে নিবেদিত প্রতিটি দ্রব্য পূজিত বিগ্রহ বা আলেখ্যের চতুর্দিকে ঘড়ির কাঁটা ঘোরার দিক অনুসারে (অর্থাৎ ডানদিকে)

ঘুরিয়ে আরতি করুন। একটি নিয়ম অনুসারে, মনে মনে গুরুদেবের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিটি দ্রব্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে হয়, তারপর রাধারাণীকে, তারপর প্রভু নিত্যানন্দকে, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে, তারপর পরমগুরু (গুরুদেবের গুরু)- কে, সবশেষে দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে। অপর পন্থা হল, প্রতিটি দ্রব্য প্রথমে দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে অর্পণ করাতে হয়, তারপর পরমগুরুদেবকে, তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে, তারপর রাধারাণী এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীল প্রভুপাদ শেষোক্ত পন্থাটি তার মন্দিরগুলিতে প্রবর্তন করেছেন। কারণ, আরাধক ভক্ত মনে করেন যে তিনি সরাসরিভাবে কোনদ্রব্যকে কৃষ্ণকে অর্পণ করার যোগ্য নন। এজন্য সবকিছুই তিনি প্রথমে নিজগুরুদেবকে অর্পণ করেন। গুরুদেব তা তাঁর গুরুদেবকে অর্পণ করেন। এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রতিটি দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়। তাই পূজক যখন প্রত্যেক দ্রব্য পরম্পরাক্রমে অন্তিমে কৃষ্ণকে নিবেদন করেন, তখন তিনি ভাবেন যে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূজায় গুরুদেবকে সহায়তা করছেন, প্রত্যক্ষ ভাবে নিজে কিছু করছেন না।

নীচের লেখা ক্রম অনুসারে আরতির দ্রব্যগুলি নিবেদন করতে হয় ঃ

১। ধূপ; ২। ঘৃত প্রদীপ;
৩। জলশঙ্খের জল; ৪। একটি বস্ত্রখণ্ড বা রুমাল;
৫। ফুল; ৬। চামর;
৭। ময়ূর পাখা।

জলশঙ্খের জল প্রত্যেক পূজ্য বিগ্রহকে নিবেদনের পর তিন ফোঁটা করে জল (এ উদ্দেশ্যে রাখা) জল পাত্রে দিন। এভাবে সকলকে জল নিবেদনের পর শঙ্খের অবশিষ্ট জলটুকু একটি জলের ঘটির মধ্যে ঢালুন। এবার জল-পাত্রটিকে বাঁহাতে নিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে এসে সমবেত ভক্তবৃন্দের মস্তকে একটু করে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিন। আরতিতে ফুল নিবেদনের পর পূজিত বিগ্রহসমূহের পাদপদ্মে একটি বা কয়েকটি করে ফুল অর্পণ করুন, আর অবশিষ্ট ফুলের কিছু বা সব সমবেত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করুন।

প্রত্যেক পূজিত বিগ্রহকে চামর ও ময়ূর পাখা দিয়ে কয়েকবার করে

ব্যজন করতে হয়। শীতকালে যখন পাখার হাওয়ার প্রয়োজন থাকে না, তখন পাখা ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। খেয়াল রাখুন যেন প্রত্যেক দ্রব্য অর্পণের আগে তা শুদ্ধকরে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদনের পর যেন হাতের শুদ্ধিকরণ করা হয়।

আরতি প্রায় ২০ মিনিটে সম্পূর্ণ হয়। তারপর তিনবার শঙ্খধ্বণি করতে হয়, আর এসময় কীর্তনও সমাপ্ত হয় (সমগ্র আরতির সময় ধরে ভক্তরা কীর্তন করতে থাকেন); তারপর প্রেমধ্বনি করতে হয় (গীতাবলী দেখুন) এবং আরতির উপকরণ-গুলি পরিষ্কার করার জন্য সরিয়ে নিতে হয়।

আরতির সময় পূজারীর মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে তিনি যা করছেন তাতেঃ পরমেশ্বর ভগবানের পূজা। পূজারীর মনোভাব হবে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ।

কখনো কখনো কেবল ধূপ, পুষ্প এবং চামর দিয়ে আরতি নিবেদন করা হয়। একে বলা হয় ধূপ-আরতি। কিন্তু ভোরের মঙ্গল আরতিতে এবং সন্ধ্যারতিতে সমস্ত উপকরণ নিবেদন করা উচিত।

পূজা

শাস্ত্রসমূহে পূজার্চনার বিবিধ জটিল পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নয়, সেজন্য এখানে একটি মৌলিক রূপ-রেখা দেওয়া হল ব্রাহ্মণ দীক্ষার পর পূজা-পদ্ধতি শেখাই যথার্থ পন্থা, তবু যেসব প্রাথমিক স্তরের ভক্ত প্রতিদিন স্বগৃহে সহজ পূজা অনুষ্ঠান করতে চান, এই সরলীকৃত পূজাপদ্ধতি তাদের জন্য। যারা ভগবানের আলেখ্য (চিত্র)-রূপ পূজা করবেন, বর্তমান নির্দেশাবলী তাদের জন্য; যেসব ভক্ত কাষ্ঠ, ধাতু, প্রস্তর বা পিতল নির্মিত বিগ্রহ পূজা করতে চান, তাদের উচিত কোন অভিজ্ঞ পূজারীর নিকট হতে পূজার নিয়মবিধি প্রত্যক্ষভাবে শিখে নেওয়া।

পূজা অনুষ্ঠান করতে হয় খুব সকালে, মঙ্গল আরতির পরে সমস্ত আলেখ্য, বেদী, ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার পর। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ, দশবিধ, ষোড়শ বা চৌষট্টি রকম উপচারে পূজার বিধান রয়েছে।

পঞ্চ উপচার হল গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ, একটি ঘৃত-প্রদীপ এবং নৈবেদ্য।

প্রথম গুরুদেব, তারপর গৌর-নিতাই এবং তারপর রাধা-কৃষ্ণ পূজিত হন। শ্রীগুরুদেবের পূজা করার পর গৌর-নিতাই এবং রাধা-কৃষ্ণের পূজা করার জন্য তাঁর অনুমতি নিতে হয় (প্রার্থনার মাধ্যমে)। পঞ্চ-উপচারে পূজা পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

প্রথমে গন্ধদ্রব্য তৈরী করুন (ঘষে নেওয়া চন্দন এবং কর্পূর মিশিয়ে এটি তৈরী করতে হয়; হাল্কা লালচে রঙের চন্দন ব্যবহার করতে হয়—তবে রক্তচন্দন নয়)। এরপর ঠাকুর ঘরের মেঝেয় কুশাসনে বসে গুরুদেবের আলেখ্যটি আপনার সামনে রাখা একটি চৌকিতে রাখুন। গুরুদেবের ললাটে একটু গন্ধদ্রব্য দিন। এরপর গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে একটি তুলসী পত্র গুরুদেবের (আলেখ্যের) দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করুন (তুলসী কেবল বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহসমূহের চরণেই অর্পিত হয়; গুরুদেবের হস্তে তা দেওয়া হল এজন্য যে তিনি তা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অর্পণ করবেন। এবার ধূপ, ঘৃত প্রদীপ এবং তারপর পুষ্প নিবেদন করুন—সঠিক যেমন ভাবে আরতির সময় নিবেদন করা হয় (আরতি নিবেদন দেখুন)। নিবেদনের পর, গুরুদেবের পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করুন। এরপর একটি সদ্য তৈরী পুষ্পমালা গুরুদেবের আলেখ্যতে দিন (পূজারী বা পরিবারের যে-কেউ ফুল তুলে মালা তৈরী করতে পারে)। এবার একইরকমভাবে পঞ্চতত্ত্বের পূজা করুন, তারপর রাধাকৃষ্ণের। এরপর ভোগ নিবেদন করুন। ফলমূল, দুধ, মিষ্টি অথবা রান্না করা খাদ্যবস্তু ভগবানকে নিবেদন করা যায়। এই সাথে পূজা সমাপ্ত হবে, এখন আরতি করা যেতে পারে।

সমগ্র পূজার সময়ে গুরুদেব, গৌর-নিতাই এবং রাধাকৃষ্ণের গুণমহিমাপূর্ণ যথোপযুক্ত মন্ত্রাদি ও ভজনগীতি কীর্তন করতে হয়।

প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলোতে প্রতিদিন একবার বা দু'বার করে বিগ্রহসমূহের পোশাক পরিবর্তন করা হয়। গৃহের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার করলেই হবে।

তুলসী

"তুলসী দেবীর সমস্তকিছুই অত্যন্ত শুভ। কেবলমাত্র তুলসী দর্শন বা স্পর্শন করে, কেবল তুলসী দেবীকে প্রণাম করে অথবা কেবল তুলসীর গুণমহিমা শ্রবণ করে বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করে সর্বমঙ্গল লাভ করা যায়। কেউ যদি উপরোক্ত পন্থাগুলির মাধ্যমে তুলসীদেবীর সেবা করেন, তিনি নিত্যকাল বৈকুণ্ঠলোকে বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেন।"

– স্কন্দপুরাণ

তুলসী বৃক্ষের সেবা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তুলসি বৃক্ষ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তুলসী পত্র এবং তুলসী মঞ্জরীর প্রতি কৃষ্ণ অত্যন্ত আসক্ত। প্রত্যেক ভক্ত যেন গৃহে অন্ততঃ একটি-দুটি তুলসীবৃক্ষ রাখেন, তাদের প্রতিদিন জলদান করেন, তুলসীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করেন এবং যত্নসহকারে তুলসী বৃক্ষের পরিচর্যা করেন। কোন গৃহে যদি তুলসী বৃক্ষটি খুব সুন্দরভাবে বিকশিত-শোভিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে গৃহে উত্তম ভক্তিচর্চা হচ্ছে, গৃহবাসীর ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হচ্ছে।

তুলসী-আরতি

তুলসী আরতি সাধারণতঃ ঠাকুরঘরের সামনের মন্দির-কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। তুলসীদেবীকে মন্দির কক্ষে আনয়নের পূর্বে বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠের পর্দা বন্ধ করে দিতে হয় (কেননা, বিগ্রহের সামনে তুলসীদেবীর পূজা করা উচিত নয়)। আরতির সময় যে টবে তুলসীদেবীকে রাখা হয় সেটি একটি সুন্দর বস্ত্রে সাজিয়ে নিতে হয়। এইভাবে সুসজ্জিত তুলসীদেবীকে মন্দিরকক্ষের মধ্যস্থলে রাখা একটি টেবিলের উপর রাখতে হয়। যখন তাকে আনা হয়, তখন একজন নীচের মন্ত্রটি আবৃত্তি করেন, আর সমবেত ভক্তবৃন্দ তাকে অনুসরণ করেন ঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি ! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

এরপর " নমো নমো তুলসী" গানটি গাওয়া শুরু হয় (গীতাবলী দেখুন) এবং সেইসাথে আরতিও শুরু হয়। আরতির পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

তুলসী আরতি অত্যন্ত সরল। আরতি পাত্রে রাখতে হয় আচমন পাত্র, একটি ঘৃত-প্রদীপ এবং ছোট এক রেকাবি ফুল। একটি দেশলাই বা মোমবাতি অথবা তৈল-প্রদীপ প্রয়োজন। যে-ভক্ত আরতি করবেন তিনি কুশাসনে দাঁড়িয়ে প্রথমে আচমন করে নেন। তখন তিনি প্রজ্জ্বলিত ধূপ তুলসী দেবীর সামনে চক্রাকারে ঘুরিয়ে আরতি করেন, এরপর একইভাবে ঘৃত-প্রদীপ এবং শেষে ফুল নিবেদন করেন।

ধূপ নিবেদনের পর তা একটি ধূপদানির মধ্যে রাখতে হয়। ঘৃত-প্রদীপে আরতির পর সেটা একজন ভক্তকে দিতে হয়। সেই ভক্ত প্রদীপটি সমবেত ভক্তদের কাছে নিয়ে গেলে প্রত্যেকে দীপ-শিখা স্পর্শ করেন। আরতিতে ফুলগুলি নিবেদনের পর কিছু ফুল তুলসীবৃক্ষের গোড়ায় রাখতে হয়, অবশিষ্ট ফুল সমবেত ভক্তদের বিতরণ করতে হয় – তারা সেগুলি আঘ্রাণ করেন।

যখন তুলসী-আরতি সমাপ্ত হয়, তখন সমস্ত ভক্তবৃন্দ তুলসীদেবীকে ডান দিকে রেখে তাঁকে বেষ্টন করে পরিক্রমা করেন, এবং সেই সময় এই পদটি কীর্তন করেন ঃ

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

এরপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়।

তুলসী সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

বিষ্ণুপূজায় তুলসীপত্র অপরিহার্য। তুলসীপত্র চয়ন করতে হয় সকালে, (রাত্রে কখনই নয়)। একটি কাঁচি কেবল তুলসী চয়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হয়। তুলসী পরিক্রমার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় তুলসীদেবীর যেন কোন আঘাত না লাগে (তুলসী কোন সাধারণ বৃক্ষমাত্র নয় – তুলসীদেবী হচ্ছেন ভগবানের এক পরম শুদ্ধ ভক্ত)।

তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী দেখা দেওয়া মাত্র তা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হয়। না হলে সর্বত্র তুলসী গাছ জন্মাবে, আর তাদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া, তুলসী মঞ্জরী ঘন ঘন ছেঁটে দিতে তুলসী বৃকক্ষটি সতেজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

তুলসী বৃক্ষকে সর্বদা জীবজন্তুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত। পথে পাশে তুলসী গাছ রাখতে নেই, কেননা লোকজন অজান্তেও তার ক্ষতিসাধন করতে পারে। ছোটদের (বড়দেরও!) এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন তার তুলসীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রবল তাপের সময় তুলসীকে ছায়া-শীতল স্থানে রাখতে হয়।

তুলসীবৃক্ষ বেশ কিছু ভেষজগুণের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ভক্তরা তাকে ভেষজ হিসাবে কখনো দেখেন না। তুলসীদেবী ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত এবং আমাদের কাছে পূজনীয়া। ভক্তরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা করেন ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির জন্য – অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

কেবলমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব-বিগ্রহ এবং আলেখ্যসমূহের চরণকমলে ভক্তিসহ তুলসীপত্র নিবেদন করতে হয় – অন্য কাউকে নয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ, শ্রীনৃসংহদেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু-প্রভৃতির পাদপদ্মেই কেবল তুলসী পত্র অর্পণ করা যায় ; সম্প্রদায় আচার্যবৃন্দ-সহ শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত এবং এমনকি রাধারাণীর পাদপদ্মেও তুলিসীপত্র নিবেদন করা যায় না। অবশ্য বিগ্রহ পূজার সময়ে গুরুদেবের দক্ষিণ হস্তে তুলসীপত্র অর্পণ করা যেতে পারে, যাতে তিনি তা কৃষ্ণের পাদপদ্মে দান করতে পারেন। ভগবানকে ভোগ নিবেদনের সময় তুলসীপত্র-সহ তা নিবেদন করতে হয়।

দৈনন্দিন কার্যক্রম

পৃথিবীর সমস্ত ইসকন মন্দিরে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নির্ধারিত পারমার্থিক কার্যক্রমে ভক্তরা সমবেত হন। গৃহীভক্তগণ যতদূর সম্ভব পরিবারের সকলকে একত্রিত করে এধরণের অনুষ্ঠান করতে পারেন। নিদিষ্ট প্রাত্যহিক ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান আমাদের কৃষ্ণভক্তিকে সুদৃঢ় ও সুস্থিত করে।

ইসকন মন্দিরগুলোতে প্রতিদিন যে নিদিষ্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, নীচে তার তালিকা দেওয়া হল। বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে অবশ্য কিছু সময়ের তারতম্য থাকতে পারে।

প্রভাতের কার্যক্রম

ভোর	৩-৪৫	ঃ	ভক্তদের জাগরণ,স্নান, তিলকগ্রহণ ও পোশাক পরিবর্তন। ✪
ভোর	৪-১৫	ঃ	মঙ্গল আরতি।
ভোর	৪-৪৫	ঃ	প্রেমধ্বনি এবং নৃসিংহ আরতি।
ভোর	৪-৫৫	ঃ	তুলসী আরতি।
ভোর	৫-০৫	ঃ	জপ শুরুর সময়। এ সময় অধিকাংশ ভক্ত জপে নিমগ্ন হন; পূজারী শ্রীবিগ্রহসমূহ পূজা করেন এবং শুদ্ধ বস্ত্রে শ্রীবিগ্রহসমূহের অঙ্গসজ্জা করেন।
সকাল	৭-০০	ঃ	শৃঙ্গার আরতি (দর্শন আরতি)।
সকাল	৭-৪৫	ঃ	গুরু পূজা (ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের পূজা)।
সকাল	৮-০০	ঃ	শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
সকাল	৯-০০	ঃ	প্রভাতী কার্যক্রমের সমাপ্তি।

✪ শীতকালে পাঠের পূর্ব পর্যন্ত সব কার্যক্রম ১৫ মিনিট বিলম্বে শুরু হয়।

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

৬-১৫ ঃ তুলসী আরতি (শীতকালে ৫-৪৫)।
৬-৩০ ঃ সন্ধ্যা আরতি (শীতকালে ৬-০০)।
৭-৩০ ঃ প্রেমধ্বনি এবং নৃসিংহ আরতি ও কীর্তন।
৭-৪৫ ঃ ভগবদ্‌গীতা পাঠ (প্রায় ১ ঘন্টা)।

গীতাবলী

এখানে উদ্ধৃত গানগুলি সারা বিশ্বের সমস্ত ইসকন কেন্দ্রে গাওয়া হল। ভক্তি গীতি সঞ্চয়ন হল এই গানগুলি-সহ আরও বহু গানের একটি সংকলন গ্রন্থ।

গাওয়ার সময়	যে-গান গাওয়া হয়
মঙ্গল আরতি	সংসার দাবানল........
তুলসী আরতি	তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী.......
গুরুপূজা	শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভক্তিসদ্ম............
সন্ধ্যা আরতি	জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা ......
গ্রন্থপাঠের পূর্বে	জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী..........
প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে	শরীর অবিদ্যাজাল ....

আরতি অনুষ্ঠানগুলিতে আরতির জন্য নির্দিষ্ট গানগুলি গাওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র গাওয়া হয়, তারপর কীর্তন চলতে থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রটি হল ঃ

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবানী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

এরপর পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র (**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।**) কীর্তন করে নিয়ে আরতি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।) কীর্তন করে যেতে হয়।

ভক্তদের সুবিধার জন্য এখানে প্রয়োজনীয় কিছু স্তব ও ভজনগীতি উদ্ধৃত করা হল।

শ্রীশ্রীগুর্বষ্টকম

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।১।।

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, যে কারুণ্য-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দ্ ॥ ২ ॥

সংকীর্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে উন্মত্ত-চিত্ত যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প-অশ্রু-তরঙ্গ উদগত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৩।।

যিনি শ্রীবিগ্রহের কেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়- এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবনজনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদ পদ্ম আমি বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রীসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, আর যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

– শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও প্রণাম

জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ।
জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ ॥
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ॥
বহির্নসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রীতুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী ! কৃষ্ণপ্রেয়সী ।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে।।
পতিতপাবন হেতু তব অবতার ।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।।

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ ! প্রেমানন্দ সুখী ।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
হা-হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এই ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

প্রতিদিন শাস্ত্র পাঠের আগে 'জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী' ভজনটি ভক্তগণ কীর্তন করেন।

জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী ॥
যশোদা নন্দন, ব্রজজনরঞ্জন;
যামুনতীর-বনচারী ॥

প্রসাদ-সেবার শুরুতে –

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্য বতাং রাজন্ বিশ্বাস নৈব জায়তে ॥
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাই চাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥

নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

শ্লোক ১

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাবাদাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

অনুবাদ

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধুর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ২

নাম্নামকরি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা
নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অনুবাদ

হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন। এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি-নিয়ম (বিধি বা বিচার) করনি। হে প্রভু! এইভাবে কৃপা করে জীবের পক্ষে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এমনই প্রবল যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না।

শ্লোক -৩

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেব কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ঃ ॥

অনুবাদ

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মত সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।

শ্লোক - ৪

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অনুবাদ

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না, আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।

শ্লোক - ৫

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

অনুবাদ

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলিসদৃশ রূপে চিন্তা কর।

শ্লোক -৬

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অনুবাদ

হে নাথ! তোমার নাম গ্রহণে করে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য-নিঃসরণের সময়ে বদনে গদ্গদস্বর নির্গত হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?

শ্লোক -৭

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

অনুবাদ

হে গোবিন্দ ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'—সমূহ 'যুগ' - বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মত অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

শোক - ৮

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার সঙ্গে যে রকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।

প্রেমধ্বনি

প্রত্যেকবার আরতির পর প্রেমধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়। তারপর ভক্তগণ 'নমস্তে নরসিংহায়' স্তবটি কীর্তন করেন (গুরুপূজায় অবশ্য এটি গাওয়া হয় না)

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত
শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কী জয়!
ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ কী জয়!
অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়! নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কী জয়!
প্রেমসে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর
শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়!
বৃন্দাবন ধাম কী জয়! মথুরা ধাম কী জয়!
নবদ্বীপ ধাম কী জয়! দ্বারকা ধাম কী জয়!
জগন্নাথ পুরী ধাম কী জয়! গঙ্গা মায়ী কী জয়!
যমুনা মায়ী কী জয়! ভক্তিদেবী কী জয়!
তুলসী দেবী কী জয়! সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয় !!
এরপর সকল ভক্ত গুরু প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করবেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ

প্রসাদ প্রস্তুতি, ভগবানকে তা নিবেদন এবং অবশেষে সেই কৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ–পুরো বিষয়টি বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভোজন করেন তা অবশ্য অভক্তদের বোধগম্য নয়, কেননা খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদনের পরও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তা স্পর্শ করা হয় নি। কিন্তু সত্যিই তিনি ভোজন করেন, আর ভক্তরা কেবল কৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পরমানন্দে ভোজন করে থাকেন।

প্রস্তুকরণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাই ভোজন করেন, যা তাঁকে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে নিবেদন করা হয়েছে। সেজন্য ভক্তেরা উত্তম ফলমূল, শাকসব্জী, শর্করা, শস্যাদি এবং দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করেন এবং গভীর যত্নে ও অভিনিবেশে তা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সুন্দর সুস্বাদ আহার্য প্রস্তত করেন।

মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, মাশরুম বা ছত্রাক, ভিনিগার এবং মুসুর ডাল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা যায় না। অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাবারও নিবেদন যোগ্য নয়।

প্রসাদ প্রস্ততিতে কেবল গরুর দুধ ব্যবহার করা যায়। কৃষ্ণের জন্য রান্নায় ঘি (কেবল গোদুগ্ধ -জাত) সর্বোত্তম। যারা ঘি সংগ্রহে সক্ষম নন, তারা তেল ব্যবহার করতে পারেন। নিয়মানুসারে তিল এবং সরিষার তেল ব্যবহার করা যায়। তবে সাধ্যে না কুলালে গৃহীভক্তরা বাদাম ইত্যাদিও ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চমানের জিনিসের দাম অত্যন্ত বেশি, সেজন্য নিজ সামর্থ্য অনুসারে গৃহীভক্ত কৃষ্ণ সেবার যত্নপর হবেন।

ভোগসামগ্রী রন্ধনের সময়, কৃষ্ণ কেমন করে তা আস্বাদন করে আনন্দ উপভোগ করবেন – রন্ধনরত ভক্ত এই চিন্তায় নিরত থাকেন। সে-সময় ভক্ত নিজের, পরিবারের বা অন্য কোন ভক্তের কথা চিন্তা করেন না। ভোগসামগ্রী যাতে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রস্তুত করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। রাঁধুনী ভক্তসহ অন্য কেউ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনের পূর্বে কিছুই 'চোখে" দেখতে পারবেন না।

ভোগ নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের জন্য একটি থালা ও গ্লাস নির্দিষ্ট রাখতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তৈরী খাদ্যসামগ্রী এক গ্লাস পানীয় জলসহ ওই থালায় রাখতে হবে। দু'এক টুকরো লেবু (বীজ বেছে নিয়ে) একটু লবণ সহ থালায় দিতে হবে। তরল খাদ্যদ্রব্য (যেমন দই) ও ব্যঞ্জনাদি কেবল ভোগ নিবেদনের উদ্দেশ্যে রাখা ছোট ছোট বাটিতে নিবেদন করা

যেতে পারে। প্রতিটি পাত্রে একটি করে তুলসী পত্র দিতে হয়।

এবার বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্র ও জলের গ্লাস-সহ থালাটি (পারশ) বেদীর সামনে রাখা চৌকির উপরে রাখতে হবে, আর বেদী না থাকলে কৃষ্ণের আলেখ্যের (চিত্রের) সামনে রাখতে হবে। আসন, ধূপ-দীপাদির ব্যবস্থা আগেই করে নিতে হবে। পূজাবেদীর সামনে বসে, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এসব খাদ্যদ্রব্য উপভোগ করবেন তা স্মরণ করতে করতে ভক্ত ঘন্টা বাজাবেন। সেই সাথে তিনি নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্র প্রতিটি তিনবার করে আবৃত্তি করবেন ঃ

১। নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

২। নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

৩। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্বিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ভক্ত যদি ইতিমধ্যে ইসকনের কোন গুরুদেবের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ প্রণাম মন্ত্র জপের পূর্বে নিজ গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র তিনবার জপ করে নেবেন।

ভক্ত ধ্যানের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী গুরুদেবেকে অর্পণ করেন, যিনি তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। ভক্ত নিজেকে সরাসরি ভগবানকে কিছু নিবেদন করার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

এবার প্রণাম-পূর্বক বাইরে এসে দ্বার বন্ধ করে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়।এ সময় দ্বারদেশে শ্রীগুরুদেব, মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের স্তব বা প্রার্থনাদি

করতে হয়; অসমর্থ হলে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন। তারপর হাততালি দিয়ে দরজা খুলুন এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদি-পূর্বক ভোগ তুলে নিন।

পারশটি (ভোগের থালা) নিয়ে এসে পাত্রের মহাপ্রসাদটুকু অন্যান্য অন্নব্যঞ্জনাদির সঙ্গে মিশিয়ে সব প্রসাদ করে নিতে পারেন, অথবা তা মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট অন্য একটি পাত্রে নিয়ে সরাসরি বিতরণ করতে পারেন।

ভোগ নিবেদনের এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল; কিন্তু প্রীতি সহকারে যদি নিবেদিত হয়, তাহলে কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক সবকিছুই গ্রহণ করে থাকেন।

ভোগ-সম্পর্কিত সংস্কৃত পরিভাষা ঃ

যে খাদ্যবস্তু ভগবানকে নিবেদনের জন্য প্রস্তত, তাকে বলা হয় 'ভোগ', বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে– 'নৈবেদ্য'। কৃষ্ণকে নিবেদিত খাবারকে বলা হয় 'প্রসাদ'। সরাসরি কৃষ্ণকে নিবেদন করার পর সেই নিবেদিত পাত্রের প্রসাদকে বলা হয় 'মহাপ্রসাদ'। আর একজন শুদ্ধভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদকে বলা হয় মহা 'মহা-প্রসাদ'।

রান্না ও আহারের বাসনপত্র

আধুনিক ভারতে রান্নায় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু এগুলি আসলে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী; পাশ্চাত্য দেশসমূহে এগুলির ব্যবহার ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের জন্য ভোগ রন্ধনে তাই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন ব্যবহার করা যায় না।

বৈদিক সংস্কৃতিতে চীনামাটি, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিক নির্মিত বাসন-কোসন অত্যন্ত নিম্ন-মান বিশিষ্ট বলে গন্য করা হয়। রূপা, পাথর এবং পিতলের তৈরী পাত্রাদিই ব্যবহারের উপযোগী। স্টীলকে অশুদ্ধ বলে মনে করা হয়, কিন্তু এখন তা উচ্চবিত্তদের গৃহেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল বাসন হচ্ছে পাতার তৈরী থালা – একবার ব্যবহার করুন, তারপর ফেলে দিন!

প্রসাদ সেবন

প্রসাদ গ্রহণ কোন সাধারণ খাবার খাওয়া মাত্র নয়। সেজন্য আমার বলি প্রসাদ 'সেবন,' "আহার" নয়। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রসাদ মানেই হল কৃষ্ণকৃপা'; কৃষ্ণ এতই কৃপালু যে এমনকি আহার্যের মাধ্যমেও তিনি আমাদের পারমার্থিক প্রগতিলাভে সাহায্য করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ এবং স্বয়ং কৃষ্ণ অভিন্ন; সেজন্য যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সাথে কৃষ্ণপ্রসাদ পরিবেশন ও সেবা করা উচিত।

প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে ভক্তগণ "শরীর অবিদ্যাজাল ...." পদটি গেয়ে থাকেন।

ভক্তরা বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন– দাঁড়িয়ে নয়, কেননা দাঁড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ কেবল সংস্কৃতি -বিরুদ্ধ নয়, তা অস্বাস্থ্যকরও বটে। পাতে দেওয়া সমস্ত প্রসাদটুকুই গ্রহণ করা উচিত। সাধারণ খাবারও ছুঁড়ে ফেলা পাপ, তাহলে কৃষ্ণপ্রসাদের কি কথা? সেজন্য পরিবেশকদের উচিত বারে বারে অল্প অল্প করে প্রসাদ পরিবেশন করা। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে কখনও বাম হাতে প্রসাদ গ্রহণ করতে নেই। প্রসাদ সেবা করতে হয় পরম সন্তোষ ও পরিতৃপ্তি সহকারে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহাপ্রসাদাখ্যান ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পূণঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩/৫৯-৬২)
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ন কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/২২৭)

খাদ্য-খাবার এবং আহার-অভ্যাস

বেদে বলা হয়েছে ঃ "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধি"। যদি কারও আহার শুদ্ধ হয়, তাহলে তার সমগ্র চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যগতভাবে যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের আহারের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কারণ, আহার্য যিনি রন্ধন বা প্রস্তত করেন, তার চেতনা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই ভক্তরা যদি এমন সব ব্যক্তির রান্না করা খাবার আহার করেন যাদের চিত্ত ও ব্যবহার দুষিত, তাহলে তাদের চেতনাও কলুষিত হয়ে পড়বে–অজান্তে রাধুনীর মানসিকতা আহারকারীদের চেতনায় সঞ্চারিত হবে। এই সঙ্গে রন্ধনকারীর পাপকর্মফলও ভোগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন,

বিষয়ীর অন্য খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬-২৭৮

সেজন্য ভক্তরা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের অভ্যাস করেন।

প্রসাদ শুধু যে কর্ম ফলের বন্ধনমুক্ত করে তাই নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ চেতনাকে কলুষমুক্ত ও বিশোধিত করে। কেননা, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে ও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিতে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে আহারের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে জীবনধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে সর্বদা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

অবশ্য সব ভক্তের পক্ষে এমনটা করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। কোন কর্মব্যস্ত অবিবাহিত মানুষ, কিংবা যাকে প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয় তারা

অনেক সময় বাইরের খাবার কিনে খেতে বাধ্য হন। যদি খাবার কিনতেই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে ফল কেনা। দুধ ও দুধের তৈরী খাবার ও (দই, মিষ্টি, পনির, ছানা ইত্যাদি) কেনা যেতে পারে; কারণ অভক্তদের দ্বারা তৈরী হলেও দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সবসময় শুদ্ধ থাকে।

বাইরের রেস্তোঁরায় কোনরূপ আহার গ্রহণ ভক্তদের পক্ষে অনুচিত। বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি ভক্ত নিতান্তই কিছু খেতে বাধ্য হন, তাহলে তাঁর উচিত কোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিরামিষ রেস্তোঁরা (বা মিষ্টির দোকান) বেছে নেওয়া। খাবারের পেঁয়াজ রসুন যেন না থাকে সেটা দেখে নিতে হবে। মাংস আছে এমন রেস্তোঁরায় নিরামিষ খাদ্য গ্রহণও অনুচিত।

সম্প্রতি ভারতজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে ডিম হল একটি নিরামিষ খাদ্য। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিষিক্ত (ferfilized) ডিম হল ভ্রূণ (যা আসলে তরল মাংস); আর অনিষিক্ত (unfertilized) ডিম হল মুরগীর রজঃস্রাব। (mensturation)শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ-ই ডিমকে আমিষ খাদ্য বলা হয়েছে। সেজন্য তথাকথিত সব বিজ্ঞানী, রাজনীতিক বা ডিম বিক্রেতাগণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত, কেননা, ভগবানে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেজন্য তাদের তৈরী ভাত রুটি মাঝে মধ্যে আহার করলে তা ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হবে। তবে তা দোকানের অর্থকামী কর্মীদের তৈরী খাবারের মত অতটা ক্ষতিকর নয় এ রকম কর্মীদের তৈরী রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি একেবারেই বর্জন করা উচিত, কেননা সে খাবার প্রগাঢ় কর্মের প্রভাব-আশ্লিষ্ট।

পেঁয়াজ ও রসুন আহার করা ভক্তদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনযোগ্য নয়। এগুলো আহার করলে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতমগুণ তমোগুণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এমনকি চা কফির মত হাল্কা নেশাও বর্জনীয়, কেননা, এগুলি স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, অপরিচ্ছন্নতাযুক্ত এবং অনাবশ্যক। এগুলো কদভ্যাস গড়ে তোলে। আর চা-কফি কখনো ভগবানকে নিবেদনও করা যায় না।

চক্‌লেটে ক্যাফিন থাকে, তাই এটিও এক ধরণের লঘু মাদকদ্রব্য। চক্‌লেট অস্বাস্থ্যকর, কারণ এতে রক্ত দুষিত হয় ও শরীরে কালো ছোপ পড়তে পারে, আর চক্‌লেট নিবেদনযোগ্যও নয়। কিন্তু ভক্ত অবশ্য চক্‌লেট খাওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন, তবু এ-ব্যাপারে রক্ষণশীল হওয়াই ভাল। চক্‌লেট ছাড়াই আমরা বেঁচে থাকতে ও কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আর চক্‌লেটকে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা তো কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নয়, কেবল আমাদেরই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য – তাই না!

অভক্তদের তৈরী বাজারে নিরামিষ খাদ্য-দ্রব্যাদি সম্পর্কে ভক্তদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যেমন বাজারের রুটি, বিস্কুট, আইসক্রীম, টিনের খাবার ইত্যাদিতে প্রায়ই ডিম থেকে তৈরী একরম উপাদান থাকে, কখনও বা গ্লিসারিন (যা জীবজন্তুর হাড় থেকে সংগৃহীত হয়) থাকে। কখনও কখনও খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা উপাদানের তালিকায় বিভিন্ন সব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লেখা থাকে। এসব খাবার নিরামিষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে এগুলো এড়িয়ে চলাই ভাল।

আসল কথা হল, যেভাবেই হোক কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করার নীতিতে অবিচলিত থাকতে হবে – সেটাই সর্বোত্তম। বর্তমান যুগের মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে ; কিন্তু বাড়ীতে রান্না খাবার সর্বতোভাবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যের সহায়ক, পারমার্থিক স্বাস্থ্যের তো কথাই নেই।

তিলক ধারণ

সকল ভক্তের জন্য তিলক ধারণ অতি প্রয়োজনীয় একটি বিধি। নিজের সুরক্ষা এবং নিজেকে শুদ্ধ রাখা – উভয়ের জন্যই তিলকের আবশ্যকতা রয়েছে। আর কপালে শোভিত সুন্দর ও শুভ তিলকচিহ্ন জগতের কাছে একটি স্পষ্ট ঘোষণা রাখে ঃ তিলক ধারণাকারী একজন বিষ্ণুভক্ত – বৈষ্ণব। আর তিলক পরিহিত ভক্তকে দর্শন করে সাধারন মানুষেরও

কৃষ্ণস্মরণ হয় এবং এভাবে তারাও পবিত্র হয়।

কখনো কখনো, কিন্তু ভক্ত পরিহাসের ভয়ে তিলক ধারণে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু যারা সাহস করে তিলক গ্রহণ করেন – এমনকি তাদের কর্মক্ষেত্রেও– তাঁরা অনুভব করেন তাদের প্রতি প্রযুক্ত চটুল পরিহাস ক্রমশঃ কিভাবে শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যেসব ভক্ত মনে করছেন যে কোনভাবেই তাঁরা প্রকাশ্যে তিলক গ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁরা অন্ততঃপক্ষে জল-তিলক ধারণ করবেন। গোপীচন্দনের তিলক ধারণের পরিবর্তে একইরকমভাবে জল দিয়ে অদৃশ্য তিলক অঙ্কন করুন, আর সেই সাথে যথাযথ মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করুন। এর ফলে অন্ততঃ মন্ত্রের রক্ষাকারী গুণগুলির উপকার লাভ করা যাবে।

তিলক ধারণের জন্য বিভিন্ন তিলকমাটি শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। অধিকাংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঈষৎ হলুদ রংবিশিষ্ট মৃত্তিকা–গোপীচন্দন তিলক ব্যবহার করেন। এই তিলকমাটি বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে এবং ইসকন কেন্দ্রসমূহে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্নানের পর তিলকধারণ করতে হয়। একজন বৈষ্ণব সর্বক্ষণ তিলক পরিহিত থাকেন। তিলক পরতে হয় এভাবে ঃ বা হাতের তালুতে একটু জল নিন। এবার ডানহাতের একটুকরো গোপীচন্দন নিয়ে বা হাতে ঘষতে থাকুন যতকক্ষণ না তা ধারণের উপযুক্ত হয়। তিলক ধারণ করার সময় শ্রীবিষ্ণুর বারটি নাম-সমন্বিত নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয় ঃ

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে ॥

বিষ্ণু দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম।
ত্রিবিক্রিমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে ॥

শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥

"ললাটে তিলক ধারণ করার সময় কেশবের ধ্যান করা কর্তব্য। উদরে তিলক ধারণ করার সময় নারায়ণের ধ্যান করা কর্তব্য। বক্ষে তিলক ধারণ করার সময় মাধবের ধ্যান কর্তব্য এবং কণ্ঠে তিলক ধারণ করার সময় গোবিন্দের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বিষ্ণুর ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় মধুসূদনের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময় ত্রিবিক্রমের ধ্যান করা কর্তব্য এবং বাম কুক্ষে তিলক ধারন করার সময় বামনের ধ্যান করা কর্তব্য। বাম বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় শ্রীধরের ধ্যান করা কর্তব্য, বাম স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময় হৃষীকেশের ধ্যান করা কর্তব্য ; পৃষ্ঠের উপরিভাগে তিলক ধারণ করার সময় পদ্মনাভের ধ্যান করা কর্তব্য এবং পৃষ্ঠের নিম্নদেশে তিলক ধারণ করার সময় দামোদরের ধ্যান করা কর্তব্য।"

–চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ঃ ২০–২০২ তাৎপর্য হতে উদ্ধৃত

তিলক ধারণ পদ্ধতি

প্রথমে ডানহাতের অনামিকা (৪র্থ আঙুল) দিয়ে একটু গোপীচন্দনের মিশ্রন নিন। এবার প্রথমে ললাটে (কপালে) তিলক অঙ্কন করুন (ছবি দেখুন)। চাপ প্রয়োগ করে লম্বভাবে দুটি রেখা ললাটে অঙ্কন করুন। রেখা টানতে হবে নাসিকা-মূল থেকে উপর দিকে কপালে (উপর থেকে নীচের দিকে নয়)। রেখাদুটিকে বেশ স্পষ্ট করার জন্য একইভাবে কয়েকবার টানতে হবে। রেখাদুটি হবে সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং সমান্তরাল। এবার গোপীচন্দন নাসা-মূল থেকে শুরু করে নাসিকায় দিন (এবার উপর থেকে নীচের দিকে)। অবশ্য পুরোপুরি নাসাগ্র পর্যন্ত তিলক লেপন করবেন না, আবার খুব ছোটও যেন না হয় – সঠিক দৈর্ঘ্য হল নাসিকার চার ভাগের তিন ভাগ। ললাটের রেখাদুটি এবং নাসিকার তিলক ঠিক ললাট ও নাসিকার সংযোগস্থানে মিলিত হবে। আয়না দেখে এটা ঠিক করে নিন। তিলক খুব সযত্নে পরিচ্ছন্নভাবে ধারণ করতে হয়।

তিলক ধারনের সময় নীচের মন্ত্রগুলো জপ করতে হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে তিলকাঙ্কনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। নীচের ক্রম অনুসারে বিভিন্ন অঙ্গে তিলক ধারণ করতে হয় ঃ

১। ললাটে –ওঁ কেশবায় নমঃ ২। উদরে –ওঁ নারায়নায় নমঃ।
৩। বক্ষস্থলে –ওঁ মাধবায় নমঃ ৪। কণ্ঠে – ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।
৫। দক্ষিণ পার্শ্বে – ওঁ বিষবে নমঃ।
৬। দক্ষিণ বাহুতে –ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।
৭। দক্ষিণ স্কন্ধে –ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।
৮। বাম পার্শ্বে –ওঁ বামনায় নমঃ। ৯। বাম বাহুতে –ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।
১০। বাম স্কন্ধ –ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।
১১। পৃষ্ঠে –ওঁ পদ্মানাভায় নমঃ। ১২। কটিতে –ওঁ দামোদরায় নমঃ।

ডানহাতের অনামিকা (চতুর্থ আঙুল) দিয়ে তিলক ধারণ করতে হয়। ডানহাতের বাহুতে তিলক দেওয়ার জন্য বাম হাতের অনামিকা ব্যবহার করতে হবে। সর্বাঙ্গে তিলকাঙ্কনের পর বাম হাতের তালুর অবশিষ্ট তিলক-মিশ্রন সামান্য জলে ধুয়ে ঐ জল "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" উচ্চারণপূর্বখ মস্তকে দিতে হবে।

পবিত্র দ্রব্যাদির যত্ন গ্রহণ

পবিত্র দ্রব্যাদি, যেমন পারমার্থিক গ্রন্থাবলী, পূজার উপকরণসমূহ, জপমালা, মৃদঙ্গ, করতাল এবং ভগবান ও তাঁর শুদ্ধভক্তদের ছবি – সবই খুব সযত্নে ও সশ্রদ্ধভাবে রাখা কর্তব্য। এগুলো সবসময় পরিচ্ছন্নভাবে ভাল জায়গায় রাখতে হবে – কখনো কোন অপবিত্র স্থানে বা কোন অশুচি জিনিসের সংস্পর্শে এসব রাখতে নেই। ব্যবহারের পর এগুলি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে হয়–এলোমেলো করে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা উচিত নয়। আর কখনই এসব পবিত্র জিনিস মেঝের উপর রাখা ঠিক নয়, কেননা যে-কেউ সেগুলো মাড়িয়ে ফেলতে পারে।

শুচিতা

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুচিতাকে এক দিব্যগুণ এবং ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণরূপে বর্ণনা করেছেন। আর অশুচিতাকে তিনি অসুরত্বের লক্ষণ বলে ঘোষনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুচিতাকে ভক্তের ছাব্বিশটি গুণের অন্যতম রূপে বর্ণনা করেছেন। আর শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর–শুচিতার নিয়ম আচারাদি তাঁর শিষ্যদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হত। এতে কেউ শৈথিল্য দেখালে শ্রীল প্রভুপাদ তার কঠোর সমালোচনা করতেন।

শুচিতার নিয়মরীতি বৈদিক সংস্কৃতিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বইয়ে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনার পরিসর নেই। এটাই বিশেষভাবে জানতে হবে যে সকল স্তরের ভক্তদের জন্য শুচিতা একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিষয়।

চিত্ত-মল বিশোধিত হয়ে অন্তরের পূর্ণ নির্মলতা ও পবিত্রীকরণ ঘটে এই মহামন্ত্র কীর্তনেঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

বাহ্যিকভাবে, ভক্ত সর্বদাই তাঁর শরীর, পোশাকাদি বস্ত্র, তাঁর জিনিসপত্র বাসস্থান এবং ব্যবহার্য অন্যান্য সব কিছু সুন্দরভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখবেন। ভক্তরা প্রতিদিন ভালভাবে ধোয়া পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবেন এবং অন্ততঃ দিনে একবার স্নান করবেন।

ইসকন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন (ISKCON- International Society for krishna Consciousness) ১৯৬৬-তে নিউইয়র্কে কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দ্রুত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করে ঃ প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই ইসকন কয়েকশত মন্দির, আশ্রম বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ এবং গুরুকুল আশ্রম সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংঘে পরিণত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতমের শাশ্বত জ্ঞান ও শিক্ষাসমূহের ভিত্তিতে ইসকন গঠিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জগদ্‌বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

পৃথিবীর সমস্ত নগরাদি গ্রামে এই দিব্যনাম পরিব্যাপ্ত হবে – শ্রীচৈতন্য দেবের এই অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্য ইসকন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসকন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিশেষ। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, তারপর পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎপরবর্তী গুরু পরম্পরাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ–এই অধ্যাত্ম পরম্পরায় ইসকনের উদ্ভব। এই পরম্পরা ধারা ইকনের প্রামাণিকতার এক অন্যতম নিদর্শন।

শ্রীল প্রভুপাদ ইসকন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। ইসকনের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তিই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হবার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা সংঘ থেকে প্রাপ্ত হবেন।

কাজের সুবিধার জন্য ইসকন সারা পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে (বর্তমানে প্রায় ৩০টি অঞ্চল) ভাগ করে করে নিয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল একজন অভিজ্ঞ ভক্তের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই পদটিকে বলা হয় গভর্নিং বডি কমিশনার বা জি. বি. সি.। কিছু কিছু অঞ্চলে দুই বা ততোধিক সহকারী জি বি সি সদস্য রয়েছেন। সমস্ত অঞ্চলের সকল জি বি সি সদস্যদের নিয়ে গঠিত জি বি সি বডি-ই হল ইসকনের সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছর একবার বিশ্বমূখ্যকেন্দ্র শ্রীমায়াপুরে জি বি সি বডি-র সকল সদস্যবর্গ সংঘের কার্যাবলীর পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মিলিত হন। ভোটের ভিত্তিতে জি বি সি বডিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রত্যেক জি বি সি অঞ্চলে কিছু-সংখ্যক মন্দির থাকে। প্রতিটি মন্দির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। তাই বস্তুতঃ ইসকনের কোন প্রধান কার্যালয় নেই, যদিও শ্রীমায়াপুরকে বিশ্বের প্রধান পারমার্থিক কেন্দ্র রূপে গণ্য করা হয়।

প্রত্যেক মন্দিরে একজন অধ্যক্ষ (টেম্প্‌ল্ প্রেসিডেন্ট) থাকেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ হলেন মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তা। জি বি সি কর্মাধ্যক্ষ নিয়মিত তাঁর নিজ অঞ্চলের মন্দির -সমূহ পরিদর্শন করেন

এবং মন্দিরে নির্দিষ্ট পারমার্থিক মান রক্ষিত এবং বিধি-বিধান সমূহ পালিত হচ্ছে কিনা, মন্দির পরিচালনা ও উন্নয়ন-কাজ সুন্দর ভাবে চলছে কিনা ইত্যাদি তিনি পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করেন। এছাড়া তিনি প্রচার কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে জি বি সি কার্য্যাধ্যক্ষদের হতে হবে "পাহারাদার কুকুর" (Watch dogs) এর মত। অর্থাৎ ইসকনের কল্যাণ বিধানের জন্য এবং অপ্রামাণিক কোন দার্শনিক মতবাদের অনুপ্রবেশ-জাত দূষণ থেকে সংঘকে রক্ষার জন্য তাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন যে " নেতা মানেই হল শ্রবণ-কীর্তনের নেতা"। সেইজন্য ইসকন নেতৃবৃন্দ কেবল পরিচালন এবং সংগঠন কার্যই নয়, এটাও প্রত্যাশিত যে তারা পরমার্থ অনুশীলন এবং আচার অভ্যাসাদির আদর্শ মান ও নিজেরা শ্রবণ কীর্তনে আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারে তাহলে ইসকনে অধ্যাত্ম-অনুশীলনের উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর ইসকনে কোন একক মুখ্য নেতা বা প্রধান নেই। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলেছিলেন যে তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতির পর তাঁর অনুগামী সমস্ত শিষ্যবৃন্দই নেতায় পরিণত হবে। কৃষ্ণভানামৃত আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করার জন্য তিনি তাঁর সকল শিষ্যবৃন্দকে একত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আদেশ দিয়েছেলেন। আর এই আদেশই এই আন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ।

প্রচারকার্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১৮-১৯) বলেছেন যে, যে ভক্ত তাঁর বাণী জগতে প্রচার করে সেই ভক্তের চেয়ে প্রিয়তর তাঁর আর কেউ নেই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই দেশ ॥

"যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর। আমার আজ্ঞায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে তুমি এই দেশ উদ্ধার কর।"

– চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৭-১২৮

অতএব কেবল নিজের উন্নতির জন্য ভক্তি-অনুশীলন করে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃতকে সকলের কাছে পৌছে দেবার জন্য ভক্তকে অবশ্যই উদ্যমশীল হতে হবে।

প্রত্যেকেই প্রচার করতে পারেন। এমনকি কোন ভক্ত যদি বৈষ্ণব দর্শনে খুব অভিজ্ঞ নাও হন, তাতে কিছু ক্ষতি নেই। তিনি কেবল যারই সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে, তাকেই হরে কৃষ্ণ কীর্তনের অনুরোধ জানাতে পারেন। অবশ্য যারা প্রচার কার্যে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত তাদের নিয়মিত শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করা প্রয়োজন।

প্রচারের সবচেয়ে ভাল পন্থা হল শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী বিতরণ। আমরা কারও সংগে শুধু কয়েক মিনিট কথা না বলে তাকে যদি একটি গ্রন্থ দিই, তাহলে তিনি এটি বাড়ীতে অন্যান্যদের সংগে তা পড়তে পারেন, অন্যকেও দিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তিপ্রাপ্ত শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থ সমূহে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনকে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থ পাঠ খুব ফলপ্রদ। আর একটি গ্রন্থ কাউকে দিলে অনেকে তা পড়তে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেজন্য গ্রন্থ বিতরণকে সবচেয়ে কার্যকরী প্রচাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমের মত কোন সাহিত্য নেই, এর কোন তুলনাই নেই। এ-গ্রন্থটি অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় হতে পারে না-এটি অনুপম, অ-প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অপ্রাকৃত গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য। প্রতিটি শব্দ-প্রত্যেকটি শব্দ। সেজন্য আমরা গ্রন্থ-বিতরনের উপর এত গুরুত্ব দিচ্ছি। যে-ভাবে হোক, যদি কারও হাতে গ্রন্থটি পৌছায়, তাহলে সে উপকৃত হবে। অন্ততঃ সে চিন্তা করবে, "ওরা বইটির এত দাম নিয়েছে, দেখিই না এর মধ্যে কি আছে !" যদি সে একটি শ্লোক – যদি সে কেবল একটি শব্দও পাঠ করে– সে ধন্য হবে। এটি এমনই এক অপূর্ব ব্যাপার। সেজন্য আমরা এত গুরুত্ব দিয়ে বলছিঃ কেবল গ্রন্থ বিতরণ কর, গ্রন্থ বিতরণ কর, গ্রন্থ বিতরণ কর !"

–শ্রীল প্রভুপাদ

প্রচারকার্য এবং গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের কর্তব্য সম্পর্কে নীচের উদ্ধৃতাংশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঃ

"সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে – তার সাধ্য অনুসারে সারা পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করে গৃহীদেরকে কৃষ্ণচেতনার অমৃতময় আলোক বিতরণ করা। যিনি গৃহী কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর দ্বারা দীক্ষিত, তাঁর কর্তব্য হল গৃহে থেকে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। সাধ্যানুসারে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিজনদের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা তার কর্তব্য। অর্থাৎ তাঁর উচিত গৃহে কৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন এবং ভগবদ্‌গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে পাঠের অনুষ্ঠান করা। পাঠ করা মানে হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা এবং ভগবদ্‌গীতা থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনা করা। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য বিপুল গ্রন্থ-সম্ভার রয়েছে। প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য হল তাঁর

সন্ন্যাসী গুরুদেবের নিকট থেকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করা। ভগবৎ সেবার পন্থায় একটি শ্রম-বিভাজন রয়েছে। গৃহস্থের কর্তব্য অর্থসংগ্রহ করা – এটি সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়। সন্ন্যাসীকে অর্থ-উপার্জন করতে হয় না – এ বিষয়ে তিনি পুর্ণরূপে গৃহীদের উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা, এবং তাঁর আয়ের অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কৃষ্ণভক্তির প্রচার কার্যে ব্যয় করা; শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা এবং বাকি পঁচিশ ভাগ কোন জরুরী অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রাখা। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে গেছেন, এবং ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে তা অনুসরণ করা।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২১-৩১-তাৎপর্য

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ,না করেন আচার ॥
'আচার', 'প্রচার', নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমিঃ সর্বগুরু, তুমিঃ জগতের আর্য্য ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১০২-১০৩)

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'উপদেশ।
আমায় আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৮)

নগর সংকীর্তন

যখন মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে অনেক ভক্তবৃন্দ মিলিত হয়ে গ্রাম নগরের পথ দিয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা করেন তখন তাকে বলা হয় নগর সংকীর্তন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং, তিনি সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন। এভাবে প্রকাশ্য পথে কৃষ্ণের দিব্য নাম সংকীর্তনের ফলে পারমার্থিক চেতনা-বিহীন কৃষ্ণবিমুখ জনগণ–প্রকৃতপক্ষে সকল জীব-সত্তাই কৃষ্ণকৃপা লাভ করে, যাদের কৃষ্ণভক্তি অর্জনের অন্য কোন সুযোগ নেই।

এরকম প্রকাশ্যে দিব্যনাম সংকীর্তনের ফলে কলিযুগের প্রভাবে কলুষিত হয়ে যাওয়া পরিবেশ পবিত্র হয়, আর সংকীর্তনে অংশগ্রহণকারী সকলেই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। এই কীর্তনে যতবেশী ভক্ত যোগদান করেন ততই ভাল, তবে যদি অনেক সংখ্যক ভক্ত না মেলে তাহলে তিন-চারজন এমনকি দুজন বা একজনও প্রকাশ্য কীর্তনে যেতে পারেন। সংকীর্তন দলের সাথে যদি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, তাহলে পরিবেশটি আরও বেশি অপ্রাকৃত ভাবোদ্দীপক হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে যদি বহুবর্ণ চিত্রিত রঙীন ফেষ্টুন, পতাকা ইত্যাদি নেওয়া হয়, তাহলে এক আনন্দোচ্ছল উৎসবমুখর পরিবেশ গড়ে ওঠে। আর মেগাফোনাদি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে উচ্চগ্রামে কীর্তন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করলে তা আরও বেশী সংখ্যক জীবের কাছে ভগবানের মঙ্গলময় দিব্য নাম পৌঁছে দিতে পারে।

এভাবে হরিনাম সংকীর্তন করুন– যত বেশি সম্ভব, যত দীর্ঘক্ষণ সম্ভব– তাহলে অচিরেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে আপনি ধন্য হবেন, সন্দেহ নেই।

একাদশী ব্রত

একাদশীর দিন সমস্ত ভক্ত উপবাস পালন করে থাকেন। একাদশী ব্রত পালন না করা একটি অপরাধ বিশেষ। প্রতিমাসে দুদিন এই উপবাস পালন করতে হয়।

সাধারণতঃ শ্রীল প্রভুপাদ সবচেয়ে সরল শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে উপবাস পালন করতেন– অর্থাৎ শস্যাদানা, কড়াই বা মটরশুঁটি, ডাল– এসব সেদিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন না। কিছু ভক্ত একাদশীর দিন কেবল ফল গ্রহণ করেন। কেউ কেউ কেবল জলপান করে ব্রত উদযাপন করেন। আবার কিছু ভক্ত কিছু গ্রহণ না করে পূর্ণরূপে উপবাস ব্রত পালন করেন (একে বলা হয় নির্জলা ব্রত)।

একদশীর দিন এই সমস্ত খাদ্যগুলি ভক্তদের বর্জন করতে হবেঃ সকল প্রকার শস্যাদানা (চাল গম ইত্যাদি), ডাল, মটরশুঁটি, বীন জাতীয় সব্জী, সরিষা, এবং এসব থেকে তৈরী খাবার যেমন আটা, সরষের তেল, সোয়াবীন তেল-প্রভৃতি। এগুলি যদি কোন খাদ্যে মিশ্রিত থাকে তবে তাও বর্জন করতে হবে (যেমন বাজারের গুঁড়ো মশলা – অনেক সময় এতে ময়দা জাতীয় কিছু মেশানো থাকে, তাই এটি বর্জনীয়)।

পরদিন দ্বাদশীতে শস্যাদানা হতে তৈরী প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে উপবাস ব্রত ভঙ্গ (পারণ) করতে হয়। পারণ অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা উচিত। একদশীর দিন-তারিখ এবং পারণের সময় জানার জন্যে বৈষ্ণব পঞ্জিকা ব্যবহার করুন (ইসকন কেন্দ্রে পাওয়া যাবে)। ইসকনের পঞ্জিকাই ব্যবহার করা উচিত, কেননা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাদশী ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ উৎসবাদির দিন-ক্ষণ নির্ধারণের পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। একাদশী ব্রত পালনোর প্রকৃত উদ্দেশ্য অবশ্য কেবল উপবাস করা নয়; নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের স্মরণ-মনন ও শ্রবণ–কীর্তনের মাধ্যমে একাদশীর দিন অতিবাহিত করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের একাদশীর দিন পঁচিশ মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরও বেশী জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নিষিদ্ধ।

চাতুর্মাস্য এবং দামোদর ব্রত

বর্ষাকালে চারমাস ধরে যে ব্রত পালিত হয় তাকে চাতুর্মাস্য বলে। কৃষ্ণবিমুখ জনগণকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্দীপিত করার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীগণ সারা বছর এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণরত থাকেন। নিয়মানুসারে বর্ষার চারমাস তারা কোন ধামে অবস্থান করেন এবং চার্তুমাস্য ব্রতের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করেন।

অবশ্য, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ইসকনের সদস্যগণ বর্ষাকালেও তাদের প্রবল প্রচার কর্মসূচী বন্ধ রাখেন না, আর সেজন্য তাঁরা কঠোরভাবে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন না। তারা খাদ্যাখাদ্যের বিধি নিষেধগুলি পালন করেন, সেগুলি হলঃ চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, দ্বিতীয় মাসে দই, তৃতীয় মাসে দুধ এবং চতুর্থ মাসে অড়হর ডাল বর্জন।

ভারতে বর্ষার সময়ে জুলাই থেকে অক্টোবর মাস হল চাতুর্মাস্য-কাল। আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশী থেকে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত—অথবা শুধু শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস – এই হল চাতুর্মাস্যের সময় কাল। সঠিক সময় জানার জন্য বৈষ্ণব পঞ্জিকা দেখুন।

চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসকে বলা হয় দামোদর মাস, কেননা এই মাসটি ভগবানের দামোদর রূপের আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট। মা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে দাম বা রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করেছিলেন – সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম হল দামোদর।
কার্ত্তিক মাসের বহু বৈষ্ণব বৃন্দাবনে গিয়ে ব্রত উদযাপন করেন। এ-সময় মন্দির গুলিতে দামোদর এবং রজ্জু বন্ধনোদ্যত মা যশোদার চিত্র বা প্রতিকৃতি রাখা হয়। এই মাসে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ভক্তগণ সমবেতভাবে "দামোদর অষ্টক' (ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন দেখুন) কীর্তন করতে করতে ঘৃত প্রদীপে (বিগ্রহ কক্ষের বাইরে মন্দিরকক্ষ থেকে) বিগ্রহগণকে আরতি নিবেদন করেন।

উৎসবসমূহ

কৃষ্ণভাবনাময় প্রতিটি দিনই কার্যতঃ একটি উৎসব। ভক্তসঙ্গে নৃত্য-গীত করে, বিগ্রহসমূহের মধুর অনুপম রূপদর্শন করে ভক্তগণ প্রত্যহ কৃষ্ণসেবার দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। তবু ভগবানের অবতারসমূহ এবং তাঁর মহান ভক্তগণের আর্বিভাব দিবস ও ভগবানের দিব্য লীলাসমূহের দিনগুলি বিশেষ উৎসব হিসাবে পালিত হয়।

এসব উৎসব পালন করলে ভগবদ্ভক্তি বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়। উৎসবকে সেজন্য ভক্তির জননীস্বরূপ বলে ভাবা হয়। সকলে একত্রে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনের জন্য উৎসবগুলি অনবদ্য আনন্দময় সুযোগ সৃষ্টি করে। যে সমস্ত ভক্ত যে কারণই হোক ইসকন কেন্দ্রে নিয়মিত আসতে পারেন না, তাঁরা প্রায়ই উৎসবের দিনগুলিতে মন্দিরে আসার উদ্যোগ নেন। যেসব ভক্তগণ ইসকন কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকেন, তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে কোন সুন্দর একটি উৎসবের আয়োজন করতে পারেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

উৎসবের দিন প্রচুর ফুল, পাতা, ফুলের মালা ও অন্যান্য নানা দ্রব্য দিয়ে মন্দিরকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রচুর সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য এ উপলক্ষে রন্ধন করে তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয় এবং তারপর পর্যাপ্ত পরিমাণে সকলকে তা বিতরণ করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণের গুণমহিমা কীর্তনের দিব্য শব্দতরঙ্গ এক আনন্দঘন চিন্ময় পরিবেশ রচনা করে।

ভক্তিমূলক নাট্যানুষ্ঠান এবং নগর সংকীর্তনের জন্য উৎসবের দিনগুলি খুবই উপযুক্ত। বিগ্রহগণকে নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ নিবেদনের জন্যও উৎসবের দিনগুলি খুবই সুন্দর উপলক্ষ (ইসকন মন্দিরে এটি করা হয়)।

উৎসবের দিন একটি নির্দিষ্ট সময়কাল উপবাস করার পর প্রসাদের ভূরিভোজ (Feasting) — এই নিয়মে অনেক উৎসব, উদ্‌যাপিত হয়।

এ সময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র-সহ উৎসব উপযোগী কিছু ভজনগীতিও কীর্তন করা হয় (যেমন, কোন মহান বৈষ্ণবের তিরোভাব তিথিতে — 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' -এই বৈষ্ণব বিরহ-গীতিটি গাওয়া হয়)। যথোপযোগী লীলাকথাও পাঠ করা হয় (যেমন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব দিবসে আমরা তাঁর দিব্য কার্যকলাপের কাহিনী পাঠ করে থাকি; গোবর্দ্ধন পূজার দিন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণঃ গ্রন্থ থেকে 'গোবর্দ্ধন পর্বত পূজা'-শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করি)। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ সমন্বিত অডিও ক্যাসেটও রয়েছে (ইংরেজী)- যা `Festivals with Srila Prabhupada'- এই সিরিজে পাওয়া যায়, এগুলি শ্রবণ করা যেতে পারে।

ইসকন ভক্তবৃন্দ যে-সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করেন, তার প্রধান কিছুর তালিকা নীচে দেওয়া হল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বর্ষের প্রথম দিন গৌর পূর্ণিমা থেকে উৎসব পালন শুরু হয়। এসব উৎসবাদির সঠিক দিন-ক্ষণ ইসকনের বৈষ্ণব পঞ্জিকায় পাওয়া যাবে। একাদশীর মত সমস্ত উৎসব-তিথিগুলি চান্দ্র গণণা অনুসারে নির্ধারণ করা হয় ; সেজন্য সৌর-ক্যালেন্ডারে প্রতিবছর তারিখের পরিবর্তন ঘটে।

গৌরপূর্ণিমা

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব দিবস। ফাল্গুনের শেষ কিংবা চৈত্রমাসে এই পূর্ণিমা আসে। চন্দ্রোদয় পর্যন্ত উপবাস ; তারপর প্রসাদ ভোজন (Feasting) এদিন চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি লীলা, এয়োদশ অধ্যায় পাঠ করেন। গৌরপূর্ণিমা ও তার আগের দিনগুলিতে শ্রীধাম মায়াপুর ইসকনকেন্দ্রে বিপুল সমারোহপূর্ণ উৎসব হয়। এ-সময় সারা বিশ্ব থেকে কৃষ্ণভক্তগণ উৎসবে গোগদানের জন্য প্রতিবছর শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন।

রামনবমী

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব দিবস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা পাঠ করুন।

নৃসিংহ চতুর্দশী

ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের আর্বিভাব দিবস। সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস। তারপর মহাভোজ। প্রভুকে 'পনকম' নিবেদন করুন। পনকম্ হল শীতল জল, তাল-মিছরি, লেবুর রস এবং আদা দিয়ে তৈরী একরকম পানীয় যা শ্রীনৃসিংহদেবের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব লীলা পাঠ করুন।

রথযাত্রা

পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রা দিবস। ভগবান শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব এবং সুভদ্রা-মহারাণীর বিগ্রহসমূহ রথে আরোহণ করিয়ে ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্য-কীর্তন করতে করতে ঐ রথ শহরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে এই রথযাত্রা-উৎসবের প্রচলন করেছেন। এ দিন কলকাতা, ভুবনেশ্বর এবং বরোদান ইসকন কেন্দ্র থেকে মহাসমারোহে বিপুল আড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হয়। পৃথিবীর নানা কেন্দ্রে বছরের নানা সময়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

ঝুলন যাত্রা

এটি হল পাঁচ দিনের এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব, এ সময় রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রচুর পুষ্প-সজ্জিত একটি দোলনায় স্থাপন করে ধীরে ধীরে দোলানো হয়, সেই সাথে কীর্তন চলতে থাকে। রাধাকৃষ্ণের আলেখ্যের (চিত্রপটের) সাহায্যেও এভাবে ঝুলনোৎসব করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীবলরামের আবির্ভাব দিবস

ঝুলন যাত্রার শেষ দিনটি হল ভগবান শ্রীবলরামের আবির্ভাব দিবস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর মহাভোজ। বলরামকে মধু নিবেদন করুন; এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলার ষষ্ঠ অধ্যায় এবং লীলপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ থেকে ভগবান শ্রীবলরামের মাহাত্ম্য পাঠ করুন।

জন্মাষ্টমী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস। কৃষ্ণাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-গোকুলাষ্টমী – প্রভৃতি নামেও এটি পরিচিত। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উপবাস এবং জাগরণ; তারপর একাদশীর দিনের মত প্রসাদ সেবন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে সারাদিন প্রচুর পাঠ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা

জন্মাষ্টমীর ঠিক পরের দিন হল নন্দোৎসব; শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক এই দিনে এই জড়জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সকল ইসকন ভক্তবৃন্দের কাছে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ; কেননা শ্রীল প্রভুপাদের করুণা ব্যতীত আমাদের কেউই কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনে সমর্থ হত না। ব্যাসপূজা উৎসব এইভাবে উদযাপিত হয়ঃ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উপবাস পালিত হয়। ভক্তগণ একত্রে সমবেত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কার্যাবলী সম্বন্ধে শ্রবণকীর্তন করেন। পূর্ব দিনের জন্মাষ্টমী পালনের ফলে ভক্তরা একটু ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন ; কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাকীর্তনের উদ্দেশ্যে তারা সে ক্লান্তি উপেক্ষা করেন। এই দিন শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী গ্রন্থগুলি (যেমন শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত) এবং ব্যাসপূজা উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ পুস্তিকাগুলি থেকে পাঠ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের স্বকণ্ঠের ভজন-কীর্তন এবং ভাষণের রেকর্ডিং বাজানো হয়। ভক্তগণ–বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যক্ষ শিষ্যগণ প্রভুপাদের মহিমা কীর্তন করেন এবং প্রভুপাদ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ অনুভব ব্যক্ত করেন।

দুপুর বারোটায় একই সঙ্গে বিগ্রহসমূহকে এবং প্রভুপাদকে প্রচুর উকরণ সমন্বিত এক মহাভোজ নিবেদন করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় পুষ্পাঞ্জলি (শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসাসনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন)।

পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি এরকম ঃ প্রত্যেক ভক্তকে অঞ্জলি-ভর্তি ফুল দেওয়া হয়। একজন ভক্ত গুরুপ্রণাম মন্ত্র (নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায়) উচ্চারণ করেন, আর সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁকে অনুসরণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণের শেষে পূর্বোক্ত ভক্তটি বলেন "পুষ্পাঞ্জলি", তখন গুরুদেবের (প্রভুপাদের) চরণকমলে পুষ্প অর্পন করা হয়। তারপর সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করেন।

এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সকল ইসকন ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাসপূজাও পালন করেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস দুপুর পর্যন্ত উপবাস এবং তারপর ভোজ–এইভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

রাধাষ্টমী

জন্মাষ্টমীর দু'সপ্তাহ পর শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব তিথি আসে। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** মধ্যলীলার অধ্যায় ২৩, ৮৬–৯২ শ্লোকসমূহে শ্রীমতী রাধারাণী সম্পর্কে পাঠ করুন; এছাড়াও লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে 'গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা' – শীর্ষক দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

বামন দ্বাদশী

ভগবানের অবতার শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব দিবস। শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, ১৮–২২ অধ্যায়ে শ্রীবামনদেবের লীলাকথা পাঠ করুন।

গোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব এবং গোপূজা

এই তিনটি অনুষ্ঠান একই দিনে উদযাপিত হয়। গোবর্দ্ধন পর্বতের পূজার মাধ্যমে গোবর্দ্ধন-পূজা উৎসব করা হয়। আর অন্নকূট মহোৎসব করার জন্য প্রথমে অন্নাদি বহুবিধ প্রসাদের "গোবর্দ্ধন পর্বত" তৈরী করুন। তারপর সেই প্রসাদ-পর্বতের পূজা করুন এবং প্রসাদ-পর্বতটি পরিক্রমা করুন। তারপর জনে জনে সকলকে এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব দিবস

গোবর্দ্ধন পূজার পর এই দিবস আসে। আর এই অনুষ্ঠানটি ঠিক ব্যাসপূজার মত; তবে এ দিন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-অনুভূতি খুব তীব্র থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর,

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-এর তিরোভাব দিবসও একইরকমভাবে পালিত হয়। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর ভোজ।

মহান বৈষ্ণবগণের এই জগত থেকে অপ্রকট হবার দিনগুলিতে তিরোভাব উৎসব উদযাপন করা হয়। এই দিনগুলিকেও উৎসব হিসাবে পালন করা হয়, কেননা জড়দেহ ত্যাগের মাধ্যমে একজন বৈষ্ণব প্রদর্শন করেন– কিভাবে মায়াকে জয় করতে হয় এবং ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করতে হয়।

শ্রী অদ্বৈত-আচার্যের আবির্ভাব দিবস ঃ

দুপুর পর্যন্ত উপবাস এবং তারপর ভোজ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করুন।

বরাহ-দ্বাদশী

ভগবান বরাহদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রীমদ্ভাগবতম, তৃতীয়স্কন্ধ, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

ভগবান নিত্যানন্দের আবির্ভাব দিবস। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদি লীলা, পঞ্চম অধ্যায় শ্রবণ করুন।

প্রণাম নিবেদন

প্রণাম নিবেদন ভক্তিময় সেবা-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; প্রণাম নিবেদনের মাধ্যমে ভক্ত তার আত্মর্পণের মনোভাবকে দৃঢ়তর করেন। বস্তুতঃ প্রণামের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা পাত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তগণ।

প্রণামের অনেক পদ্ধতি রয়েছেঃ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম নিবেদন করা যায়, আবার মাথা, হাত ও পায়ের নিম্নাংশ ভূমি-স্পর্শ করেও প্রণাম করা যায়।

প্রণাম-কালে নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থনামন্ত্র শ্রবণযোগ্য করে উচ্চারণ করা উচিত। সবসময় প্রণম্য বিগ্রহকে বাঁদিকে রেখে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশের সময় এবং মন্দির হতে বের হবার সময় বিগ্রহসমূহকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। প্রণাম-সহ সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যম হচ্ছেন গুরুদেব। সেজন্য বিগ্রহগণকে প্রণাম নিবেদন করার সময় গুরুপ্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয় (আরও তথ্যের জন্য 'গুরুদেব এবং দীক্ষা' অধ্যায় দেখুন)।

সকল ইসকন মন্দিরে একটি ব্যাসাসন রয়েছে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আলেখ্যরূপে বা বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যথার্থ প্রণাম বিধি হল ঃ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন এবং তারপর অন্যান্য বিগ্রহসমূহকে প্রণাম; আর মন্দির ত্যাগের সময় বিপরীতক্রমে–অর্থাৎ প্রথমে বিগ্রহগণকে এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন। তুলসীদেবীকে প্রণামের সময় তুলসী প্রণাম মন্ত্র 'বৃন্দায়ৈ তুলসী দেবৈ'- উচ্চারণ করতে হয়। সাধারণতঃ তুলসী আরতির সময় তুলসীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়, তবে অন্য সময়েও তা করা যেতে পারে।

বৈষ্ণব শিষ্টাচার অনুসারে ভক্তদেরকেও প্রণাম করতে হয়। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এটা আমাদের দ্রুত পারমার্থিক উন্নতিবিধানে এবং ভক্তদের মধ্যে পরস্পরিক প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক তৈরীতে সাহায্য করে।

নিজ গুরুদেবের আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা একটি অবশ্য পালনীয় বিধি। সন্ন্যাসীদেরকে অন্ততঃ দিনের প্রথমে বার দর্শনের সময় প্রণাম করা কর্তব্য। সকল ভক্তগণকে, বিশেষতঃ প্রবীণ ভক্তদেরকে দিনের প্রথমবার দেখার পর প্রণাম করা খুব সুশোভন একটি অভ্যাস।

শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম নিবেদন করতে হয় তাঁর নামোল্লেখ-সমন্বিত বিশেষ প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে। অন্যান্য সকল বৈষ্ণবগণকে নিম্নে প্রদত্ত প্রণাম মন্ত্রের দ্বারা প্রণাম করতে হয়ঃ

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সকল ইসকন কেন্দ্রে প্রভাতে তুলসী আরতির পর সমবেত ভক্তগণ প্রণত হয়ে উক্ত প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম নিবেদন করেন।

সাধারণতঃ যখন কোন ভক্তকে প্রণাম করা হয়, তখন ভক্তটি প্রতিপ্রণাম করেন। অবশ্য ভক্তসমাজে প্রবীণেরা খুব নবীন কোন ভক্তকে প্রতি-প্রণাম নাও করতে পারেন। বরং তারা সেই ভক্তের পারমার্থিক উন্নতি কামনা করে তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন। সন্ন্যাসীগণ এবং দীক্ষাদানকারী গুরুবর্গ এই রীতি অনুসরণ করে থাকেন।

বৈষ্ণব বেশ

যদিও বৈষ্ণবের মত পোশাক পরিধান অপরিহার্য-কিছু নয়, কেননা বাহ্য বেশের চেয়ে আন্তর-চেতনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তবু এর গুরুত্ব রয়েছে। ঠিক যেমন একজন পুলিসকে তার ইউনিফর্ম দেখে চেনা যায় (এবং সবাই তার সাথে সেইভাবে আচরণ করে), তেমনি বৈষ্ণব বেশ ধারণের মাধ্যমে একজন ভক্ত একজন দায়িত্বশীল কৃষ্ণভক্ত হিসাবে নিজেকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করেন। যে-সমস্ত ভক্ত এরকম বেশ গ্রহণ করেন, তারা প্রতিদিনই কৌতুহলী জনগণের কাছে কেন তারা ভক্ত হয়েছেন তা ব্যাখ্যা করার আনন্দময় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাই বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলে প্রচার করার একটি বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়।

তাছাড়া কেউ বৈষ্ণব বেশ ধারণা করলে তার উপর যথার্থ বৈষ্ণবের মত আচার-আচরণের দায়িত্বও বর্তায়। সাধুর বেশধারণকারীকে অবশ্যই সাধুর মত মর্যাদাপুর্ণ ভাবে চলাফেরা করতে হয়– এটাই প্রত্যাশিত। সেজন্য কৃষ্ণভক্তের নির্দিষ্ট বেশ আমাদের ভক্তোচিতভাবে চলতে সাহায্য করে। আর এটা বাস্তব যে বাহ্যিকভাবে যদি আমাদের বৈষ্ণবের মত দেখায়, তাহলে নিজেকে বৈষ্ণব হিসাবে অনুভব করতেও তা আমাদের সাহায্য করে।

অন্যদিকে অধুনা জনপ্রিয় পশ্চিমী পোশাক আপনা থেকেই এক ভোগী

অভক্তের ভাব মনে সঞ্চারিত করে। পশ্চিমী পোশাক পশ্চিমী ধ্যান-ধারণার সাথে সম্পৃক্ত ; পাশ্চাত্য জগতের জীবনধারা প্রধানতঃ যৌনবাসনা এবং ভোগতৃষ্ণা-কেন্দ্রিক–আর সেজন্য সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তা বর্জন করা। যদি কেউ প্রকাশ্যে বৈষ্ণব বেশধারণে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তবে তিনি স্বগৃহে তা করতে পারেন; অথবা অন্ততঃ গৃহে ভজনের সময় এবং মন্দির দর্শনের সময়ে তিনি বৈষ্ণব বেশ পরিধান করতে পারেন।

আদর্শ বৈষ্ণব বেশ এরকম ঃ পুরুষদের জন্য তিলক, তুলসীমালা, মুণ্ডিত মস্তক এবং গ্রন্থিযুক্ত শিখা (শিখা দেড় ইঞ্চির বেশী চওড়া হওয়া উচিত নয়)। মন্দিরের বাইরে বসবাসরত যে-সমস্ত গৃহীভক্ত মস্তক মুণ্ডিত রাখতে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাঁরা খুব ছোট করে ছাঁটা চুল রাখতে পারেন–লম্বা চুল নয়, কেননা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণ লম্বা চুলকে আপত্তিজনক বলে মনে করেন। মুখমণ্ডল থাকবে পরিষ্কার করে কামানো –দাড়ি, গোঁফ বা জুলফি কিছু রাখা চলবে না। পোশাক– ধুতি এবং পাঞ্জাবী।

ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বস্ত্র পরেন। অন্যান্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত পুরুষেরা সাদা পোশাক ব্যবহার করেন। ভক্তিমূলক নয় এমন ছবি বা কথার ছাপ দেওয়া টি-শার্ট বৈষ্ণবদের পরিধানের উপযোগী নয়।

চর্ম-নির্মিত জুতো, পোশাক, ব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

সুশোভন পোশাক পরিহিত একজন বৈষ্ণব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত একজন অভিজাত ভদ্রলোকের ন্যায় প্রতিভাত হন।

স্ত্রীলোকদের জন্য ঃ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পোশাক (শাড়ী), তিলক এবং মালা। কোন পশ্চিমী ফ্যাশন নয় বা খোলা চুল নয়; বাঙালীদের মত মাথার দু'ভাগে বিভক্ত চুল, দেহের অবিশিষ্টাংশ স্বামী-পুত্ররা ছাড়া অন্যদের উপস্থিতিতে সর্বদাই আবৃত রাখতে হবে।

দিব্যধামসমূহ

সারা ভারত-জুড়ে অসংখ্য বৈষ্ণব তীর্থস্থান ছড়িয়ে রয়েছে ; আজ ও ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সে-সব স্থান দর্শন করে থাকেন। এরকম দিব্যস্থান দর্শনের মাধ্যমে ভ্রমণের প্রবণতা সঠিকভাবে চরিতার্থ করা যায়।

ধামবাসী সাধুদের সঙ্গ এবং তাদের কাছ থেকে ভগবৎকথা শ্রবণের মাধ্যমে এরকম তীর্থযাত্রার যথার্থ সুফল গ্রহণ করতে হয়–এটাই শাস্ত্রসমূহের উপদেশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আধুনিক যুগে পারমার্থিক শিক্ষাদানের কেন্দ্রস্থল হিসাবে তীর্থক্ষেত্রগুলির গুরুত্ব মানুষ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন এবং শ্রীধাম মায়াপুর এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থান, কেননা তা হল পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থল। মায়াপুর এবং বৃন্দাবন ধামে ইসকনের সুন্দর সুন্দর মন্দির রয়েছে, যেখানে দূরাগত অতিথি এবং ভক্তদের আহার ও রাত্রিযাপনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এই দুটি কেন্দ্রেই শিক্ষিত উন্নত সব ভক্তরা রয়েছেন যাদের সংগে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং পারমার্থিক প্রগতির জন্য আলোচনা পরামর্শ করা যেতে পারে। সকল ভক্তগণকে শ্রীমায়াপুর এবং শ্রীবৃন্দাবনের ইসকন মন্দির যে-কোন সময় পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অন্যান্য যে-সমস্ত তীর্থস্থানে ইসকনকেন্দ্র রয়েছে সেগুলি হল : তিরুপতি, পুরী, কুরুক্ষেত্র, গুরুভায়ুর এবং পাঞ্জাবপুর।

শাস্ত্রানুসারে যে-স্থানে বিষ্ণু -বিগ্রহ অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং বিশেষতঃ যে -স্থানে ভক্তগণ কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত, সেই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র।

★ বিস্তারিথ জানার জন্য গ্রন্থশেষে প্রদত্ত তালিকা দেখুন।

সেইজন্য সকল ইসকন কেন্দ্রসমূহ–এমনকি বড় বড় শহরে স্থাপিত কেন্দ্রগুলিও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদের দর্শন, তাদের কৃপাশীষ লাভ এবং তাদের সেবা করার উপযুক্ত স্থান। অনেক ইসকন কেন্দ্র নিয়মিতভাবে কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক সেমিনার, বিভিন্ন কোর্স এবং প্রশিক্ষণ কার্যসূচী পরিচালিত করে থাকে। এ-বিষয়ে আরও জানার জন্য আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

ভক্তোচিত মনোভাব

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে উক্ত তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলির একটি রয়েছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মুখবন্ধেঃ "কৃষ্ণভক্তিতে প্রগতি নির্ভর করে ভক্তের ভক্তোচিত মনোভাবের উপর"।

কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব একটি অত্যন্ত বিস্তৃত বিষয়; তবে নবীন কৃষ্ণভক্তদের (এবং বস্তুতঃ সমস্ত ভক্তের) জন্য দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণঃ দৈন্যতা এবং সেবার মনোভাব।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "ক্রমশঃ বিনীত এবং আত্মসমর্পিত হয়ে ওঠার ভিত্তিতে ভক্তিযোগের সমগ্র পন্থাটি রচিত" (চৈঃ চঃ আদি ৭/১৪)।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসিদ্ধ শিক্ষাসমূহের একটি হল, একজন বৈষ্ণব নিজেকে একটি তৃণের থেকেও সুনীচ বলে মনে করবেন। এরকম উচ্চ-স্তরের বিনয় লাভ করা খুব দূরূহ, তবু প্রকৃত ভক্ত হবার অভিলাষে আমাদের তা লাভের জন্য চেষ্টাশীল থাকতে হবে।

কিন্তু প্রায়ই নবীন ভক্তরা তাদের পারমার্থিক প্রগতির মিথ্যা গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে পড়ে। হয়ত ভাল ভজন গাইতে বা সুন্দর মৃদঙ্গ বাজাতে পারার জন্য, বা অনেক শ্লোক মুখস্ত থাকার জন্য, জাতিতে ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য কিংবা উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য– অথবা অন্যান্য অনেক বোকামিপূর্ণ কারণে অনেক সময় নবীন ভক্তরা গর্বের মনোভাব পোষণ করতে থাকেন– তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এমকম অহঙ্কার ভক্তের প্রকৃত পারমার্থিক উন্নতির অভাবেরই পরিচায়ক।

প্রকৃতই যিনি কৃষ্ণভক্ত হতে অভিলাষী, তাঁকে তাঁর অন্তর হতে এসব অহংকার অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

নূতন কৃষ্ণভাবনা গ্রহণকারীদের আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হল যথার্থ সেবার মনোভাবের অভাব। জড়জগতে অধঃপতিত জীবাত্মা হিসাবে আমরা সুদীর্ঘকাল জড়মায়ায় বদ্ধ হয়ে আছি, ফলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কৃষ্ণভক্তির পন্থা গ্রহণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল আমাদের হৃদন্তঃস্থ সুপ্ত ভগবৎ সেবার প্রবণতা পুনর্জাগরিত করা। কৃষ্ণভক্তির অর্থই হল সেবা–অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ সেবা–গুরুদেবের সেবা, বৈষ্ণবগণের সেবা, দিব্য ধামসমূহের সেবা এবং দিব্য নাম সমূহের সেবা। বস্তুতঃ **হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থই হল ভগবান এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির নিকট তাদের সেবায় নিযুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন।**

ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রত্যক্ষভাবে সবা করার জন্য আমাদের সর্বদা তৎপর থাকা উচিত। মন্দির পরিস্কার করা হোক, রান্নার জন্য শাকসব্জী বানানো হোক অথবা তাঁর মহিমা প্রচারই হোক–কৃষ্ণের জন্য সম্পাদিত সমস্ত সেবা কাজই অপ্রাকৃত এবং জড়কলুষ-নাশক। যে-ধরণের সেবাই আমাদের করতে বলা হোক, আমাদের তা অত্যন্ত সুচারুরূপে বিবেকবুদ্ধির সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে আমরা দ্রুত কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতিসাধনে সক্ষম হব। অলসভাবে শৈথিল্যের সংগে কাজ করলে প্রত্যাশিত ফল লাভ করা অসম্ভব।

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, ব্যক্তিগত যশ-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি, বা আমাদেরকে একটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দানের জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নি। কোনরকম বাহ্যিক অভিলায-শূন্য হয়ে ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত একজন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আর এ-লক্ষ্যে দ্রুত উন্নতি লাভের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্বকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী নিয়মিত পাঠ করবেন এবং যথার্থ বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও সেবার মনোভাব নিয়ে ভক্তিযুক্ত সেবার্চ্চায় নিয়োজিত হবেন, সেই ভক্তের মধ্যে এই তত্ত্ববোধ আপনাথেকেই উদিত হবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গৃহে পারমার্থিক পরিবেশ রচনা

সংস্কৃতে গৃহীদের প্রতি প্রযুক্ত দুটি অভিধা রয়েছে ঃ "গৃহস্থ" এবং "গৃহমেধী"। "যিনি গৃহে পুত্র কলত্র-সহ বাস করছেন এবং জীবনের পরমোদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে অবগত ও তা অর্জনে তৎপর– তিনি হচ্ছেন গৃহস্থ", আর অধ্যাত্ম-ভাবনা-বর্জিত অন্য সকল গৃহীদের (সাধারণ জড়বিষয়াসক্ত মানুষ) বলা হয় "গৃহমেধী"। গৃহস্থের গৃহ-কে বলা হয় "গৃহস্থ-আশ্রম"। এটি একটি আশ্রম, কেননা এটি পরমার্থ-অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, আর সমগ্র গৃহাঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র একটি মন্দির এখানে রয়েছে।

পরিবারের সদস্যগণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন এবং প্রতিটি কর্ম তারা কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যতাঁকে উৎসর্গ করেন। গৃহে ভগবদ্‌বিগ্রহের উপাসনা এরকম সেবার মনোভাব অর্জনের সহায়ক। সেজন্য গৃহস্থের পক্ষে বিগ্রহ-আরাধনা অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা অন্যথায় তারা সহজেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত হয়ে পড়তে পারেন।

গৃহে অপ্রাকৃত পরিবেশ রচনা করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধভক্তদের আলেখ্য-চিত্রাদি রাখুন। চিত্র-তারকা, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ্ এবং এরকম অন্য কারও স্থান কোন কৃষ্ণভাবনাময় গৃহে নেই ; সেজন্য এদের ছবি থাকলেও তা সরিয়ে ফেলা কর্তব্য।

গৃহকে প্রবলভাবে অধ্যাত্ম-ভাবময় করে তোলার একটি খুব কার্যকর উপায় হল পূর্ণ এক সেট শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী গৃহে রাখা। এই গ্রন্থগুলি ভগবানের শাস্ত্ররূপ অবতার এবং তাই সেগুলি বিগ্রহদের মতই পূজ্য।

ভক্তিমূলক ভিডিও প্রদার্শনের জন্য টেলিভিশকে ব্যবহার করা যেতে পারে ; কিন্তু সাধারণভাবে এটি একটি উৎপাত বিশেষ। এগুলি বর্জন করে চলতে পারলেই গৃহের মঙ্গল। টিভিকে প্রায়ই 'বোকা-বাক্স' (Idio-box) বলা হয়, কেননা যে -সব কার্যক্রম টিভিতে দেখানো হয়, তা

মূলতঃ অসার অর্থহীন জড়ীয় বিষয় মাত্র। টিভিকে বিদায় দিন। বরং গৃহে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করুন! ভাবছেন অসম্ভব? বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় নিমগ্ন হোন; সুন্দরভাবে তাঁর আরতি করুন, তাঁর বিদ্যমান উল্লাসভরে কীর্তন করুনঃ দেখুন কেমন অচিরেই আপনি বোকা-বাক্স-র প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন!

রেডিও শোনা আর সিনেমার চটুল গান বাজানোর পরিবর্তে বৈষ্ণব ভজন গান করুন আর শুদ্ধভক্তিময় ভজনের ক্যাসেট শ্রবণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করুন।

শৈশব থেকে সন্তানদের কৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদান করা পিতামাতার কর্তব্য। গৃহে পিতার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে–তাঁকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহের শিক্ষকস্বরূপ হতে হয়। সকলকে সযত্নে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য।

অধনা অপি যে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদগৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥
(সনৎ কুমারাদি ঋষিগণের ন্যায়)

(যাহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায়) পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্তমান থাকে, তাহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য) (ভাঃ ৪/২২/১০)

শুণ মিশ্র, কলিকালে নাহি তপ, যজ্ঞ।
যেইজন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
সংশয় পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
(চৈঃ ভাঃ)

আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ

প্রায়ই পরিবারের কোন সদস্য কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করলে অন্য সকলেই ভক্তে পরিণত হন। এটি একটি অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ।

অবশ্য যদি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভক্ত হতে না চায়, তখন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কখনো কখনো শুধু পরিবারের সদস্যরাই নয়, বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীরাও উদ্যমী নবীন ভক্তকে বাতিকগ্রস্ত বলে মনে করে এবং তার উপর সবধরণের চাপ দিতে শুরু করে। কখনো কখনো তারা ভক্তটিকে অকৃতজ্ঞ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেও ভাবতে থাকে।

এটা নূতন কিছু নয়। বহুযুগ আগে মহান কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের একমাত্র অপরাধ ছিল যে তিনি তাঁর বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

যাঁরা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির প্রতি এমনকি অল্পমাত্রও আকৃষ্ট হয়েছেন, প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে তারা কোন কিছুর বিনিময়েই তা ত্যাগ করতে পারেন না। ভক্তটি হয়ত তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে সম্মত করাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজনরাও সেই ভক্তকে কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগে রাজী করাতে পারেন না।

সর্বদা আমাদের অস্তিত্বের আসল বাস্তবসত্যের কথা ভেবে দেখুন ঃ বন্ধুবান্ধব, পরিবার, দেশ এবং আরও সকলকিছুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সদা পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী। এটি ঠিক নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া তৃণের মত। কখনো হয়ত কিছু তৃণ একত্রে মিলে একটি গুচ্ছ তৈরী করে ; তারপর অচিরেই ঢেউয়ের আঘাতে তারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়, এবং আবার হয়ত অন্যান্য তৃণের সঙ্গে নূতন গুচ্ছ তৈরী করে। ঠিক তেমনি প্রবল পরাক্রমশালী কাল-রূপ নদীতে আমরা এক দেহ

হতে অপর দেহে ভেসে চলেছি। প্রতিবারই আমরা আমাদের নূতন পাওয়া একটি কুকুরদেহ, শূকরদেহ, মানব দেহে বা অন্য কোন জীবদেহে প্রবলরূপে আসক্ত হয়ে পড়ছি।

আরেকটি উপমাও দেওয়া যেতে পারে ঃ একটি পান্থশালায় বা হোটেলে যখন কিছু অপরিচিত ভ্রমণরত অতিথি দু'একদিন থাকবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু তারা পরস্পরের খুব বেশী ঘনিষ্ঠ হয় না– কেননা তারা জানে যে সামান্য কয়েকদিন পরই প্রত্যেকই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।

জড়জাগতিক জীবনধারায় পারিবারিক সম্পর্ক এবং দায়-দায়িত্বকে সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ভাবা হয়। কারণ পারিবারিক জীবনই জড়-অস্তিত্বের ভিত্তি-স্বরূপ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫-৫-৫)। কিন্তু সমস্ত ভক্তদের– এমনকি যেসব ভক্ত গৃহে পরিবারের সদস্যদের সাথে জীবন কাটাচ্ছেন তাদেরও দৃঢ়ভাবে জানতে হবে, এই পারিবারিক আসক্তির আসল উৎসটি কি; আর তা হল ঃ মায়া।

আরেকটি কথা হল, যাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের পারিবারিক বা সামাজিক– কোনরকম দায় দায়িত্ব থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১-৫-৪১) স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত -নৃণাং পিতৃণাম্
ন কিঙ্করো নায়ং ঋণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা য শরণং শরণ্যম্
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি সকল বাসনা পরিত্যাগ করে অনন্য চিত্তে মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেছেন এবং সর্বান্তঃকরণে ভক্তিযোগ অবলম্বন করেছেন, তাঁর দেব, ঋষি, জীবকূল, পিতৃপুরুষগণ, মানবসমাজ বা পরিবারের প্রতি কোন ঋণ, দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য থাকে না। "

প্রকৃত পক্ষে, যে-ভক্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজে সমর্পণ করেছেন, তিনি তাঁর পরিবারের সবচেয়ে বড় সেবা করেন। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উর্ধ্ব ও অধঃ অনেক পুরুষকে দুরতিক্রম্য এই জড়-সংসার-কূপ হতে উদ্ধার করেন (শ্রীমদ্ভাগবত-৭-১০-১৮)।

কৃষ্ণভক্তির জন্য যা কিছু অনুকূল তা সবই গ্রহণ করতে হবে, আর যা কিছু প্রতিকূল তা বর্জন করতে হবে। যে পরিবেশ একজন ভক্তের পক্ষে অনুকূল, তা অন্য একজনের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে।

যদি আমাদের গৃহ যথার্থ কৃষ্ণভক্তি অর্জনের পক্ষে অনুকূল না হয়, তবে পরিবারের সদস্যদের কৃষ্ণসেবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবরকমে আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য। অন্ততপক্ষে তাঁরা যাতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকে সহ্য ও শ্রদ্ধা করতে শেখেন– সেজন্য আমরা চেষ্ঠা করতে পারি।

যারা কৃষ্ণভক্তি অর্জনের বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প, অথচ যদি অভক্ত-পরিবৃত গৃহে তাদের বাস করতে হয়, তবে আমরা তাদের এটুকুই বলতে পারি যে কৃষ্ণভক্তি চর্চার বিধি-নিয়মের সঙ্গে আপস না করেও তারা যেন গৃহে যতদূর সম্ভব শান্তি রক্ষা করে চলেন। অবশ্য এসব পরিবারের সদস্যরা এমনিতে সাধারণতঃ খুব ভালই; কিন্ত আমরা এমন আশা করতে পারিনা যে সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃতের সর্বোচ্চ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এটা প্রায়ই ঘটে থাকে যে একজন ভক্ত ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা চালিয়ে তাঁর পরিবারের কৃষ্ণবিমুখ, এমনকি শত্রুভাবাপন্ন সদস্যদেরও উত্তম কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছেন।

আর সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি পরিবারের সদস্যবর্গ কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি অনমনীয়রূপে বিরূপভাবাপন্ন থাকেন, তাহলে সেই গৃহ ত্যাগ করে পূর্ণ সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে এই গৃহত্যাগের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। " যে-ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি লাভ করাকে জীবনের পরমলক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করেছেন, এমনকি ইতিমধ্যে তিনি গৃহস্থ জীবনে জড়িয়ে পড়লেও যতশীঘ্র সম্ভব গৃহস্থলীর আকর্ষণ পরিত্যাগ করার জন্য তাঁর সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২৩-৪৯, তাৎপর্য)।

অবশ্য যে-সব গৃহস্থের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি তার উপর নির্ভরশীল, তাদের হঠাৎ গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় না। কিন্তু যাদের বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশি এবং যে-সব যুবক এখনো অবিবাহিত, তাদের গৃহত্যাগ করে ভক্তসঙ্গে যোগদান করে পূর্ণ সময় কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য। সাধারণ জড় বিষয়াসক্ত মানুষের মত তাদের সমগ্র জীবনটি গৃহে অতিবাহিত করার কোন প্রয়োজন নেই। "বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে গৃহীদের অবশ্যই পঞ্চাশ বছর বয়সের পর গৃহত্যাগ করা কর্তব্য" (শ্রীমদ্ভাগবতঃ ৩-২৪-৩৫, তাৎপর্য)।

একটি বিষয়ে সর্বদা দৃঢ় নিশ্চিত থাকা উচিতঃ যত কষ্টকরই হোক না কেন– কোন পরিস্থিতিতেই ভগবদ্ভক্তির পথ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন না, দৃঢ় শ্রদ্ধায় ভক্তিচর্চায় নিয়োজিত থাকেন, কৃপাময় কৃষ্ণ তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন।

কৃষ্ণভক্তিতে অবিচলিত থাকবার জন্য আমাদের দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ থাকা উচিত। যদি পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের না বুঝতে পারে–এমন কি সমগ্র জগতও যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়, তবু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পক্ষে রয়েছেন, সুতরাং আমাদের কিছুই হারানোর নেই, বা শঙ্কিত হবারও কোন কারণ নেই।

নারী-পুরুষ সংসর্গে বিধিনিষেধ

"পুংসঃ স্ত্রীয় সিথুনী ভাবমেতম
তর্য়োহ হৃদয়-গ্রন্থিং আহুঃ।
অতো-গৃহ -ক্ষেত্র-সুতপ্ত বিত্তৈ
-র্জনস্য হোময়ং অহং মমেতি ॥"

অনুবাদ ঃ "নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ জড় অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। এই অলীক আকর্ষণ, যা নারী এবং পুরুষের হৃদয়কে পরস্পর সংবদ্ধ

করে-তার বশবর্তী হয়ে মানুষ দেহ, গৃহ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-পরিজন এবং ধনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাবে সে মায়ার অলীকতায় মোহিত হয়ে পড়ে এবং 'আমি', 'আমার' – এরূপ মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে সবকিছু চিন্তা করতে থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগত, ৫-৫-৮।

বৈদিক সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষ মেলামেশায় বিধিনিষেধ কেবল ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের জন্যই নয়, বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রেও তা আরোপিত হয়েছে। বিবাহিত দম্পতি অবশ্যই পরস্পর মেলামেশা করবেন; কিন্তু সে মেলামেশার উদ্দেশ্য হবে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনে পরস্পরকে সহায়তা করা। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর অনাবশ্যক মেলা-মেশাও উভয়ের অধঃপতনের কারণ হয়ে উঠতে পারে (বিষয়টি লেখককৃত (Brahmacarya in Krishna Consciousness গ্রন্থটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে)।

কৃষ্ণভক্ত দম্পতি ভক্তসন্তান জন্মদানের জন্য মিলিত হয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে পবিত্র করে তোলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গৃহী শিষ্যদের যৌনসংসর্গের পূর্বে অন্ততঃ পঞ্চাশ মালা জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মিলনকালে পিতামাতার চেতনা অনুসারে তদুপযোগী একটি জীবাত্মা মাতৃগর্ভে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে সন্তানের জন্মদান করা হলে সন্তানেরাও কৃষ্ণভক্ত হবে।

কলহ ও প্রতারনাপূর্ণ এই আধুনিক যুগে বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি স্বার্থকেন্দ্রিক ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তির পরিবর্তে কৃষ্ণভক্তি অর্জন হয়, তাহলে অবশ্যই পরিবারিক জীবন পবিত্র ও শান্তিময় হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণভাবনাময় গার্হস্থ্য জীবনের বিষয়টি খুব বিস্তৃত ; বর্তমান গ্রন্থে এটির বিশদ আলোচনার পরিসর নেই। যাঁরা পারিবারিক জীবনধারাকে পারমার্থিক করে তুলতে আগ্রহী, তাঁরা ইসকনের অভিজ্ঞ, প্রবীণ গৃহস্থ সদস্যগণের সঙ্গে পরামর্শ এবং পতনির্দেশের জন্য যোগাযোগ করলে উপকৃত হবেন।

ইসকনের সদস্য হোন

অনেকরকম সংঘ-সংগঠন আছে যেখানে একই উদ্দেশ্যসম্পন্ন সদস্যরা তাদের কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রে মিলে কাজ করেন। যেমন ব্যবসায়ীরা গঠন করেন চেম্বার্র অব কমার্স, আর শ্রমিকেরা গঠন করেন লেবার ইউনিয়ন প্রভৃতি। ঠিক সেরকম ইসকন বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ হল সেইসব মানুষের জন্য যাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা।

ইসকনে বিভিন্ন ধরণের সদস্যপদ রয়েছে। পূর্ণ সময়ের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন এমন ভক্তদের নিয়ে সংঘের আশ্রমগুলি গড়ে ওঠে, এবং এই সমস্ত ভক্ত ভক্তজীবনের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা অঙ্গীকার করে নেন। তারা সারা দিন ধরে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু বিনিময়ে একটি পয়সাও পারিশ্রমিক চান না। অবশ্য তাদের খাদ্য পোশাকাদি সমস্ত প্রয়োজন ইসকনই পূরণ করে থাকে। ইসকনে এরকম বহু সহস্র কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষতঃ যুববৃন্দের অবিলম্বে এগিয়ে আসা উচিত এবং নিজেরা কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা করে অন্যদের কাছে প্রচারের জন্য তাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। ইসকন আশ্রমসমূহে মূলতঃ যে-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি হল পূজা, ভজন, কীর্তন, মন্ত্রসমূহ, দর্শনতত্ত্ব, রন্ধন প্রণালী, স্বনির্ভরতা এবং পারমার্থিক নেতৃত্বদান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃষ্ণভক্তিমূলক সেবার মনোভাব–কিভাবে কৃষ্ণশরণাগত হতে হয় – সেই শিক্ষা।

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চান তাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রগুলিতে যোগযোগ করুন।

এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা কৃষ্ণভক্তি চর্চার খুব উদ্যমশীল, কিন্তু সন্তানাদি থাকার জন্য তাঁরা আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ সময়ের জন্য ইসকনে ভগবৎ সেবায় যোগদিতে পারছেন না। তাঁরা নিজ গৃহেই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে পারেন।

এ বইয়ে প্রদত্ত নির্দেশগুলি পালন করলে তারা গৃহে থেকেও নিঃসন্দেহে পূর্ণকৃষ্ণভক্তি অর্জনে সক্ষম হবেন।

যাঁদের পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে, তাঁরা একটি নিদিষ্ট অংকের অর্থ দান করে ইসকনের আজীবন সদস্য হয়ে যেতে পারেন।

আর যারা উপরোক্ত কোন পন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নন, তাদের কাছে অনুরোধ যে দয়া করে তারা যেন অন্ততঃ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত এই মহামন্ত্র নিয়মিত কীর্তন করেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইসকন নুতনভক্ত প্রশিক্ষণ

কৃষ্ণভক্ত হয়ে আশ্রমবাসী হওয়ার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা এই বিশেষ বিভাগে যোগাযোগ করলে তাদের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়। আজ সারা পৃথিবীতে যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তাতে যোগদান করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত যুবকরা ভারতভূমিতে পাওয়া মনুষ্য জন্মকে সার্থক করুন।

আবশ্যকীয় যোগ্যতা–

১। অবিবাহিত, শিক্ষিত (নুন্যতম মাধ্যমিক) কর্মঠ যুবক হতে হবে।
২। মূল প্রত্যয়ন পত্রাদি (যেমন– Character Certificate) অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
৩। বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হওয়া আবশ্যক।

যোগাযোগ – ইসকন নুতন ভক্ত প্রশিক্ষণ
রুম নং– ১২২, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া –৭৪১৩১৩

ইসকন যুবগোষ্ঠী

সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পথভ্রষ্ট যুবকদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করা এবং এক অপার্থিব শান্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে ইসকন যুবগোষ্ঠী (IYF)। এই মহান লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য ইসকন যুবগোষ্ঠী সারাবছর বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সততা, শৌচ, দয়া, তপঃ ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে প্রকৃত বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়াস করে চলেছে। জাতিগত ঐতিহ্যের পটভূমিতে এবং কর্মজীবনে ভারতের যুবসমাজ অন্তরে ভগবৎ বিশ্বাসী হয়েই রয়েছে। তাই তারা যুবগোষ্ঠীর সদস্য হয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষালাভ করতে পারেন – ✪ জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, ✪ পুনর্জন্ম ✪ কর্ম ✪ যোগ ✪ আত্মা ইত্যাদি।

এছাড়া ইসকন মায়াপুরে যুবকদের আরও উৎসাহিত করার জন্য বাৎসরিক যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যুবগোষ্ঠী আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ছাত্র ও যুবকগণ ৫০% বিশেষ ছাড়ে যুব ছাত্রাবাসে রাত্রিবাস করতে পারেন। অধিক তথ্যের জন্য অনুগ্রহ পূর্বক এই ঠিকানায় যোগযোগ করুন।

ইসকন যুবগোষ্ঠী
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া–৭৪১৩১৩
ফোন – (০৩৪৭২) ৪৫-৩০৮

ছাত্রছাত্রীদের জন্য

'জাগ্রত ছাত্র সমাজ'

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যাহার।
জনম সার্থক করি কর পর উপকার ॥

যথার্থ পরোপকার সাধনের নিমিত্ত, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে নুতন পথ নির্দেশ করার জন্য ইসকনের পক্ষ থেকে পারমার্থিক ছাত্র-সংগঠন 'জাগ্রত ছাত্রসমাজ' গঠন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ইসকন পরিচালিত 'জাগ্রত ছাত্রসমাজের' সদস্য বা সদস্যা হয়ে ইসকনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এই সংগঠন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

১। যে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ব্যক্তিগতভাবে 'জাগ্রত ছাত্র সমাজের' সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন। স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে এই 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' গঠন করা যেতে পারে।

২। সপ্তাহের যে কোনো একটি নিদিষ্ট দিনে, কর্তৃপক্ষের সুবিধামতো স্কুলে, ক্লাবে, দেবালয়ে বা যে কোনো জায়গায় সাপ্তাহিক মিলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩। এই সংগঠনকে ইসকন শ্রীমায়াপুরে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে কোনো অনুদান লাগবে না। তবে প্রত্যেক স্কুল সংগঠনকে একটি করে ইসকন প্রকাশিত 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' ও জীবন আসে জীবন থেকে 'গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে।

৪। প্রাথমিক অবস্থায়, প্রত্যেক 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' সাপ্তাহিক মিলনের দিন শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারন করে কার্যক্রম শুরু করবেন এবং তারপর কিছু সময় 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জীবন আসে জীবন থেকে'

গ্রন্থ পাঠ করে শ্রবণ করবেন, এইভাবে নিয়মিত দুই মাস অনুষ্ঠান করে সফল হলে পরবর্তী কার্যক্রম জানানো হবে।

৫। প্রত্যেক সাপ্তাহিক মিলনের বিবরণ শ্রীমায়াপুরে পাঠাতে হবে।

৬। 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' এর সদস্য পদ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

১। 'জাগ্রত ছাত্র সমাজে'র সদস্য পরিচয়পত্র।

২। প্রতি চারমাস অন্তর 'সমাচার পত্রিকা'।

৩। ইসকন প্রকাশিত যে-কোনো গ্রন্থে ৫% ছাড়।

৪। শ্রীমায়াপুরে বিভিন্ন শিক্ষাশিবিরে যোগদান।

৫। পুরী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য ট্যুরে যোগদান।

৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্তদের সঙ্গে পত্রবন্ধু করার সুযোগ।

৭। আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক জীবন গঠনের জন্য যথাযথ উপদেশ বা মার্গ-দর্শন।

বিঃ দ্রঃ 'জাগ্রত ছাত্র সমাজে'র সদস্য পদের জন্য বার্ষিক অনুদান মাত্র ২১ টাকা।

যোগাযোগ – বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ
ইসকন – শ্রীমায়াপুর
নদীয়া – ৭৪১৩১৩

ভগবদগীতা পত্রবিনিময় (করেস্‌পণ্ডেস্‌) কোর্স

সমগ্র বিশ্বে ভগবদগীতার শ্বাশ্বত সনাতন জ্ঞান স্পর্শ করছে বহু মানুষের জীবনকে, তাদের জীবন ধারায় আনছে আমূল পরিবর্তন। আমাদের বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী তথা সাধারণ মানুষদের ভগবদীতার অমৃতময় দিব্যজ্ঞানের আস্বাদ দানের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর প্রচার বিভাগ বাংলা ভাষায় একটি ভগবদ্গীতা পত্রবিনিময় কোর্স প্রবর্তন করেছে। এই কোর্সের মাধ্যমে নিখুত ভাবে জানা যাবে –

১। এই মহাবিশ্ব কি ? তার উৎস ও কারণ কি ?
২। ভগবান কে ? তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ?
৩। প্রকৃতি বা জড় জগৎ কি ? তার নিয়ন্তা কে ?
৪। কেন প্রতিটি মানুষ দুঃখ, দুর্দশা উৎকন্ঠায় জর্জরিত ?
৫। কিভাবে আনন্দময় জীবন লাভ করা যায় ?
৬। কিভাবে মানব সমাজে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় ?

এবং আরো অনেক কিছু।

এই স্টাডি কোর্সের জন্য রেজিঃ ফিঃ ৬০ টাকা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। তখন বিস্তারিত নিয়মাবলী ও প্রথমখন্ডটি পাঠানো হবে। ভগবদ্গীতাটি মোট তিনটি খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি ২ মাসের মধ্যে একটি খণ্ড পড়ে উত্তর পাঠাতে হবে এবং ৬ মাসের মধ্যেই এই কোর্স সম্পূর্ণ হবে। পরিশেষে ৪০ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত প্রতিযোগীদের পুরস্কার সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। বিশেষ কৃতি প্রথম তিনজনকে আকর্ষনীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। আরো বিস্তারিত জানতে নিম্মোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

গীতা কোর্স বিভাগ

ইসকন, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

ভারতে জন্মলাভের মাহাত্ম্য

"ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বছরের পরমায়ুর চেয়ে পুণ্যভূমি ভারত বর্ষে ক্ষণকালের জন্যও আকাঙ্খিত, কেননা এমনকি কেউ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হলেও সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হলে তাকে আবার বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হবার জন্য ফিরে আসতে হয়। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর গ্রহলোকে অবস্থিত এই ভারতবর্ষে জীবনকাল খুব দীর্ঘ নয়, নিতান্তই ক্ষণকালের, তবু যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন, তিনি অনন্যভক্তি সহকারে ভগবানের চরণকমলে শরণগ্রহণের মাধ্যমে এমনকি এই ক্ষণকালের জীবনেও নিজেকে পরম পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারেন। এই ভাবে তিনি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন-যেখানে একটি জড় দেহে পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভোগের কোন সমস্যা নেই।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এই উক্তিতে এ-কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার ॥

যিনি ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিক্ষা-নির্দেশ অবগত হবার পূর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেছেন। এইভাবে তিনি এই মানবজন্ম লাভ করে কি করা কর্তব্য সে-বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তার কর্তব্য হল অন্যান্য সকল মত-পথ, ধর্ম পরিত্যাগে করে কেবল কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কৃষ্ণ অবিলম্বে তাঁর ভার গ্রহণ করবেন এবং পূর্বের পাপময় জীবনের সকল কুফল থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন (অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ-ভ.গী.-১৮-৬৬)। সেজন্য কৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নির্দেশ দিয়েছেন-'মম্মানা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু'ঃ **"সর্বদা আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমার ভক্তহও। তুমি আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর"।**

এই পন্থা খুবই সহজ-এমনকি একটি শিশুর পক্ষেও। কেন এই পন্থাটি আপনিও গ্রহণ করবেন না ? প্রত্যেকের উচিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা এবং এইভাবে ভগবদ্ধামে উন্নীত হবার জন্য নিজেকে পূর্ণরূপে যোগ্য করে তোলা (ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন)। কৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া-এটাই জীবনের পরম প্রয়োজন। এই সর্বোত্তম সুযোগটি ভারতের অধিবাসীদের বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। যিনি তাঁর নিজ আলয় ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁকে শুভ বা অশুভ-কোনরূপ কর্মের ফলভোগের জন্য কখনো জড়বন্ধনে আবদ্ধহতে হয় না।

শ্রীমায়াপুর নামহট্টের একটি আবেদন

নিজ গৃহে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর 'ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ-

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥

"অতএব অর্জুন, সর্বক্ষণ আমাকে স্বরণ করে তোমার কর্তব্যকর্ম যুদ্ধ করা উচিত। তোমার মন এবং বুদ্ধি আমাকে অর্পণ করে কার্য করলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।"

"তিনি অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থেকে তাঁর ধ্যান করতে আদেশ দেননি। ভগবান কোনও অসম্ভব পরামর্শ দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি বলেছেন, "আমাকে স্বরণ করে তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম করে যাও।' ভগবান কখনই কোন অযৌক্তিক উপদেশ দেন না। এই জড় জগতে দেহ ধারণ

করতে হলে কাজ করতেই হবে ; কর্ম অনুসারে মানব সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে ব্রাহ্মণেরা বা সমাজের বুদ্ধিমান লোকেরা এক ধরনের কাজ করছে, ক্ষত্রিয়েরা বা পরিচালক সম্প্রদায় এক ধরণের কাজ করছে, এবং ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের বিশেষ ধরণের কাজ করছে। মানব-সমাজে প্রত্যেককেই, সে শ্রমিকই হোক, ব্যবসায়ী হোক, যোদ্ধা হোক, চাষী হোক, এমন কি সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে যে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা তত্ত্ববিদ্গণ-এদের সকলকেই জীবন ধারণ করার জন্য তাদের নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম করতেই হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে, সব সময় সকল কর্তব্যকর্মের মাঝে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর পাদপদ্মে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম করে যেতে। দৈনন্দিন জীবনে কর্তব্যকর্ম করার সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা না যায়, তবে মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা সম্ভব হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাই আমাদের সর্বক্ষণ চব্বিশ ঘন্টাই ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করে – এবং তাঁর সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত হয়ে আমাদের প্রতিটি মূহুর্তে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে।"

কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিময় সেবা চর্চা করা প্রত্যেকের জীবনেই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন মন্দিরে বা আশ্রমে কৃষ্ণ ভক্তদের সান্নিধ্যে থেকে ভক্তিময় সেবা চর্চা করা অবশ্য অনেক সহজ। কিন্তু আপনি যদি দৃঢ়সংকল্প হন তাহলে আপনি আপনার স্বগৃহেই কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করতে পারেন এবং এভাবে আপনার গৃহকে একটি মন্দিরে পরিণত করতে পারেন।

কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি সুন্দর দিক হল, যতটুকু ভক্তি অনুশীলন আপনি নিজের পক্ষে সম্ভব বলে মনে করছেন ততটুকুই আপনি অভ্যাস করতে পারেন। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোন ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে মহা ভয় থেকে ত্রাণ করে।" তাই আপনার দৈনন্দিন জীবনে কৃষ্ণকে গ্রহন করুন; শীঘ্রই আপনি তাঁর সুখময় ফল অনুভব করতে পারবেন।

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের বিভিন্ন স্তর

নীচে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা হল, যা আপনি জীবনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম বজায় রেখেও আপনার স্বগৃহে অভ্যাস করতে পারেন। আপনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে যে স্তরটি অভ্যাস করতে পারবেন, সেটি আপনি বেছে নিন ইসকন আপনাকে ঐ স্তরের ভক্তি-অনুশীলনের নির্দেশনা ও প্রেরণা দান করবে এবং ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে আপনাকে সাহায্য করবে।

শ্রদ্ধাবান ঃ যে-ভক্ত ভক্তিসেবায় নিম্নবর্ণিত বিধি শর্তাদি মেনে চলতে সক্ষম হবেন, তিনি একজন শ্রদ্ধাবান ভক্ত হিসাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের জন্য শ্রী শ্রী রাধামাধবের কৃপা আশীর্বাদ লাভ করবেন।

১। তিনি মন্দির বা নামহট্ট ভক্তগোষ্ঠীর একজন সক্রিয় ভক্ত, অর্থাৎ তিনি যত বেশীবার সম্ভব মন্দির বা নামহট্ট সংঘে যান এবং মন্দিরে বা নামহট্টের ভক্তিমূলক কার্যক্রমগুলিতে যোগদান করেন।

২। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ এক মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৩। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাসমূহ পাঠ করেন।

সাধুসঙ্গী ঃ যে ভক্ত শ্রদ্ধাবান ভক্তের উপযোগী উপরোক্ত শর্তসমুহ পালন করা ছাড়াও ভক্তিসেবার নিম্নবর্ণিত বিধিনিয়মগুলি মেনে চলতে সক্ষম হবেন, তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধব ও শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের কৃপা-আশীর্বাদে ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন সাধুসঙ্গী ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি মন্দির বা নামহট্ট সংঘে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার মিলিত হয়ে সাধুসঙ্গ করেন।

২। তিনি প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ মালা জপ করেন।

৩। তিনি জুয়া, পাশা খেলা ও অবৈধ স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গ বর্জন করে চলেন।

কৃষ্ণ সেবক ঃ যে ভক্ত ভক্তসঙ্গী ভক্তের পালনীয় উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ

করা ছাড়াও ভক্তিসেবার নিম্নবর্ণিত বিধিনিয়মগুলি মেনে চলতে সক্ষম হবেন তিনি শ্রী শ্রী রাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদে ধন্য হয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারী একজন কৃষ্ণ সেবক ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ তাঁর প্রতিনিধিবর্গের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে নিজ জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত ভক্তি-চর্চায় উন্নতি সাধন এবং শুদ্ধতা অর্জনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন।

২। তিনি স্বীকার করেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান।

৩। ইসকন মন্দিরে বা নামহট্ট সংঘে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসবের সময়- যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা প্রভৃতিতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সক্রিয় ভক্তিসেবায় অংশগ্রহণ করেন।

৪। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ ৪ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৫। তিনি আমিষ খাবার (মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি) বর্জন করে চলেন এবং নৈতিক জীবন যাপন করেন।

কৃষ্ণ সাধক ঃ কোন ভক্ত যদি উপরের কৃষ্ণসেবক ভক্তোপযোগী শর্ত-সমূহ পূরণ করা ছাড়াও ভক্তিমূলক সেবার নিম্নোক্ত বিধি শর্তাদি পালন করতে পারেন, তাহলে তিনি শ্রী শ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদ ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন কৃষ্ণসাধক ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধিবর্গের তত্ত্বাবধানে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ অনুসারে ধীরে ধীরে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ এবং তা অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তিমার্গ-সম্মত জীবন যাপনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

২। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন এবং যত বেশী সম্ভব ইসকনের পাঠের ক্লাসগুলিতে অথবা নামহট্ট সংঘের পাঠে যোগ দেন (অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একদিন ভগবদ্গীতা পাঠের ক্লাসে)।

৩। তিনি নিজ গৃহে সাধ্যমতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পূজাবেদী স্থাপন, আরতি ও খাদ্যদ্রব্য নিবেদন, পবিত্র তুলসী বৃক্ষের সেবা-পূজা প্রভৃতি করেন এবং

খুব ভোরে ওঠার সাধারণ নীতিনিয়ম মেনে চলেন।

৪। তিনি প্রতিদিন ৮ থেকে ১৬ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৫। তিনি মদ্যপান, মাংসাহার ও দ্যুতক্রীড়া (তাস; জুয়া ইত্যাদি খেলা) এবং বিবাহ-বহির্ভূত অবৈধ যৌনক্রিয়া বর্জন করে শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন করেন।

৬। তিনি বৈষ্ণব-পঞ্জিকায় উল্লেখিত উৎসব-পর্বদিনে এবং একাদশীর দিনগুলিতে উপবাস পালন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রম ঃ যে ভক্ত উপরোক্ত গৌর/কৃষ্ণ সাধক ভক্ত হবার শর্তগুলি পূরণ করা ছাড়াও ভক্তি সেবার নিম্নবর্ণিত বিধিনিয়মগুলি পালনে সক্ষম, তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদ-ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয় ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত নীতিসূত্রগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য আশ্রম লাভ করার জন্য কৃতসংকল্প।

২। তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে কৃষ্ণভক্তি মহামন্ত্র জপ করেন।

৩। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ ১৬ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৪। তিনি চা, কফি সহ সমস্ত রকমের মাদকদ্রব্য, পেয়াজ, রসুন সহ সকল প্রকার আমিষ খাবার তাস-জুয়া খেলা, সিনেমা, খেলাধুলা এবং অবৈধ যৌনক্রিয়া কঠোরভাবে বর্জন করে চলেন।

৫। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী সুসংবদ্ধভাবে পাঠের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং তিনি অন্যদের নিকট কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে (তার সাধ্যানুসারে) নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করেন।

৬। তিনি নিয়মভিত্তিক ভাবে মন্দিরের বা নামহট্ট সংঘের সাথে সম্পর্কিত সেবাকাজ (সেবাটি যতই সরল সাধারণ হোক না কেন) গ্রহণ করেন।

৭। তিনি ভোরে শয্যাত্যাগ, যতদুর সম্ভব মন্দিরের প্রাত্যহিক কার্যসূচীগুলি গৃহে অনুসরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বগৃহেই একটি কঠোর সাধন - বিধি মেনে চলেন। এছাড়া তিনি প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার মন্দিরের বা নামহট্টের শ্রীমদ্ভাগবতম পাঠের ক্লাসে যোগ দেন।

শ্রীগুরু চরণাশ্রয় ঃ যে-ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয় ভক্তের পালনীয় উপরোক্ত শর্তগুলি পূরণ করা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিধিশর্তাদি পূরণে সক্ষম তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদ-ধন্য হয়ে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনকারী একজন শ্রীগুরু চরণাশ্রয় ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি ইসকন গুরুবর্গের মধ্যে কোন একজন গুরুদেবের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেছেন।

২। তিনি কমপক্ষে ৬ মাস 'শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়' ভক্তোপযোগীবিধিশর্তাদি পালন করেছেন এবং মন্দির অধ্যক্ষ বা নামহট্ট পরিচালকের নিকট থেকে এর জন্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

৩। ইসকনের নিয়মপদ্ধতি অনুসারে এই স্তরের ভক্তের জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট লিখিত পরীক্ষায় তিনি যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন।

নিজ অবস্থার বিবৃতি দিয়ে যোগাযোগ করুন ঃ

গৃহে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের বিভিন্ন স্তরের যে স্তরে আপনি অধিষ্ঠিত আছেন, দয়া করে তার বিবৃতিগুলো নিজের নাম ঠিকানা সহ পত্রের মাধ্যমে জানান। তাহলে সেই অনুসারে আপনাকে একটা স্বীকৃতি পত্র প্রদান করা হবে। তারপর এর পরের স্তরে অধিষ্ঠিত হলে আবার জানালে পুনরায় আর একটা স্বীকৃতি পত্র প্রদান করা হবে।

অধিক তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক এই ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করুন ঃ

শ্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট কার্যালয়
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর
জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৩
ফোন - (০৩৪৭২)৪৫২২৭।

ভক্তদের প্রাথমিক করণীয় ও অকরণীয় কিছু নির্দেশ

১। বৈষ্ণবভক্তের সবসময় গুরু, ভগবান, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রণাম করা উচিত।

২। সর্বদা কাচা, ধোয়া কাপড় জামা পরা উচিত।

৩। কখনো রুঢ় ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৪। কখনোই নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৫। অতিরিক্ত ঘুমানো বা জেগে থাকা উচিত নয়।

৬। তিলক ধারণ করার পর আচমন করা উচিত।

৭। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করাউচিত নয়।

৮। প্রস্রাব করার পর জল ব্যবহার করা উচিত।

৯। পায়খানা করার পর স্নান করা উচিত।

১০। প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত-পা ও মুখ ভালো ভাবে ধোওয়া উচিত।

১১। কখনো মিথ্যাকথা বলা, হিংসা করা, অপরের বদনাম করা, কারো সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়।

১২। কখনো কারো কিছু চুরি করা উচিত নয়।

১৩। অট্টহাস্যকরা বা ব্যঙ্গ করা উচিত নয়।

১৪। মুখ না ঢেকে হাঁচা, হাইতোলা উচিত নয়।

১৫। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

১৬। প্রাসাদ পাওয়ার সময় থু থু করা বা প্রসাদ পাওয়া অবস্থায় কাউকেও পরিবেশন করা উচিত নয়।

১৭। মহিলাদের প্রতি হিংসা করা বা তাদের প্রতি অপমান করা উচিত নয়।

১৮। কখনো কারো ক্ষতি করা উচিত নয় বরং উপকার করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯। বিবেকহীন অসৎ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

২০। অসৎশাস্ত্র পাঠ বা অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

২১। পতিত ব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

২২। রাত্রিতে অসতী মহিলার সঙ্গে ঘোরা উচিত নয়।

২৩। অসৎ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

২৪। অজ্ঞ, বোকা, পীড়িত, কুৎসিত, খোঁড়া ও পতিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

২৫। ক্ষৌরকর্ম করলে শ্মশানে গেলে এবং যৌনসঙ্গ করলে স্নান করা উচিত।

২৬। কারো মাথায় আঘাত করা বা চুল ধরে টানা উচিত নয়।

২৭। বস্ত্রবিহীন স্ত্রী বা পুরুষের দিকে তাকানো উচিত নয়।

২৮। একমাত্র পুত্র বা শিষ্য ছাড়া শিক্ষাদানের সময় কাউকেই প্রহার করা বা তিরস্কার করা উচিত নয়।

২৯। প্রসাদ পাওয়ার পর ঐস্থান সত্বর পরিষ্কার করা উচিত।

৩০। রাত্রিতে ছোলার ছাতু এবং দই খাওয়া উচিত নয়।

৩১। সন্ন্যাসীদের তিন এবং ব্রহ্মচারীদের দুইবার স্নান করা উচিত।

৩৩। গর্ভ মন্দিরে ঘুমানো উচিত নয়।

৩৪। কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়।

৩৫। খাওয়ার জলে থু-থু ফেলা উচিত নয়।

৩৬। কেউ যদি অপমান করে তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং বোঝানো উচিত, যদি না বোঝে তবে সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত।

৩৭। ভোর চারটের আগে শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

৩৮। প্রতিদিন মঙ্গল আরতিতে যোগ দেওয়া উচিত।

৩৯। খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা উচিত।

৪০ ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোওয়া ও স্নান করা উচিত।

৪১। ব্রহ্মচারীদের কখনো একা একা ঘোরা উচিত নয়।

৪২। ঘরের মধ্যে চুল, দাঁড়ি, নখকাটা বা দাঁত মাজা উচিত নয়।

৪৩। প্রতিদিন ভালোভাবে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও ধোওয়া উচিত।

৪৪। গুরুদেবের আদেশ বা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪৫। শ্লোক এবং স্তোত্রাবলী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা উচিত।

৪৬। কারো নিকট যাতে কোনরূপ অপরাধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৪৭। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে হাত-পা ভালো করে ধোওয়া উচিত।

৪৮। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ, কৃষ্ণলীলার চিন্তা বা কৃষ্ণনাম করা উচিত।

৪৯। সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মুর্তি বা ছবি দর্শন করা এবং প্রণাম করা উচিত।

৫০। জপ-মালা কখনো মাটিতে রাখা উচিত নয় ; জপমালা নিয়ে বাথরুমে যাওয়া উচিত নয়; জপমালাকে সর্বদা পবিত্র বলে মনে করা উচিত। ১৬ মালার বেশি জপ করতে অভ্যাস করা উচিত; পারত পক্ষে মালা সম্পূর্ণ করে রাখা উচিত। কারো চরণ স্পর্শ করে সেই হাতে জপমালা স্পর্শ করা উচিত নয়।

ভারতে ইসকন কেন্দ্রসমূহ

১। আগরতলা, ত্রিপুরা– আসাম-আগরতলা রোড, বনমালীপুর, ৭৯৯০০১।
২। আহমেদাবাদ, গুজরাট– স্যাটেলাইট রোড, গান্ধীনগর হাইওয়ে ক্রসিং, আহমেদাবাদ-৩৮০০৫৪।
৩। এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ–১৬১, কাশী নগর, বালুয়াঘাট, এলাহাবাদ-২১১০০৩।
৪। বামনবোর, গুজরাট– এন. এইচ. ৮-এ, সুরেন্দ্র-নগর, ডিস্ট্রিক্ট।
৫। বাঙ্গালোর, কর্ণাটক– হরেকৃষ্ণ হিল, ১ 'আর' বক্স, কর্ড রোড, রাজাজী নগর, ৫৬০০১০।
৬। বরোদা, গুজরাট– হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, গ্রোত্রী রোড, ৩৯০০২১।
৭। বেলগাঁও, কর্ণাটক– সুফ্রারর পেঠ, তিলক শুয়াদী, ৫৯০০০৬।
৮। ভুবনেশ্বর, ওড়িশা– ন্যাশনাল হাইওয়ে নং-৫, নয়াপল্লী, ৭৫১০০১।
৯। বম্বে/মুম্বই, মহারাষ্ট্র–৭ কে. এম. মুন্সী রোড, ছৌপট্টি, ৪০০০০৭।
১০। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৩ সি অ্যালবার্ট রোড, ৭০০০১৭। ফোন– (০৩৩) ২৪৭-৩৭৫৭/২৪৭-৬০৭৫।
১১। চন্ডীগড়– হরেকৃষ্ণ ল্যাণ্ড, দক্ষিণ মার্গ, সেক্টর ৩৬-বি, ১৬০০৩৬।
১২। কোয়েম্বাটোর, তালিলনাড়ু– ৩৮৭, ভি. জি. আর. পুরম, ডঃ আলাগেসান রোড - ৬৪১০১১।
১৩। গঙ্গাপুর, গুজরাট– ভক্তিবেদান্ত রাজবিদ্যালয়, কৃষ্ণলোক, সুরাট-বরদৌলি রোড, গঙ্গাপুর, পো. গঙ্গাধর, জেলা- সুরাট-৩৯৪৩১০।
১৪। গৌহাটি, আসাম– উলুবাড়ী ছরালী, গৌহাটি - ৭৮১০০১।

১৫। গুন্টুর, অন্ধ্রপ্রদেশ– শিবালয়ম, পেডা কাকানি - ৫২২৫০৯।
১৬। হনুমকোন্ডা, অন্ধ্রপ্রদেশ– নীলাদ্রি রোড, কাপুয়াড়া, ৫০৬০১১।
১৭। হরিদ্বার, উত্তরপ্রদেশ– ইসকন, পোঃ বক্স, হরিদ্বার, ইউ. পি. ২৪৯৪০১।
১৮। হায়দরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ– হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, নবপল্লী স্টেশন রোড-৫০০০০০১।
১৯। ইম্ফল, মণিপুর – হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, এয়ারপোর্ট রোড, ৭৯৫০০১।
২০। জয়পুর, রাজস্থান– পো. বক্স. ২৭০, জয়পুর - ৩০২০০১।
২১। জম্মু ও কাশ্মীর – শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রম, শ্রীল প্রভুপাদ মার্গ, কাটরা (বৈষ্ণব মন্দির) ১৮২১০১।
২২। কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা– ৩৬৯ গুড্রি মহল্লা, মেইন বাজার, ১৩২১১৮।
২৩। লখনৌ, উত্তরপ্রদেশ– ১, অশোকনগর, গুরুগোবিন্দ সিংমার্গ, ২২৬০১৮।
২৪। মাদ্রাজ (চেন্নাই), তামিলনাড়ু– ৫৯, বুরটিক রোড, টি. নগর, ৬০০০১৭।
২৫। মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ– শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩। ফোন– (০৩৪৭২) ৪৫-২৭৫/৪৫-২৩৪/৪৫-২১৮/৪৫২-২৮০
২৬। মৌরাঙ, মণিপুর– নংবন ইংখন, টিডিম রোড।
২৭। মুম্বই (বম্বে), মহারাষ্ট্র – হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, জুহু - ৪০০০৮৯।
২৮। মুম্বই, মহারাষ্ট্র – শিবাজী চক, স্টেশন রোড, ভায়ুন্দর (পশ্চিম). থানে - ৪০১১০১।
২৯। নাগপুর, মহারাষ্ট্র– ৭০ হিল রোড, রামনগর, ৪৪০০১০।
৩০। নিউ দিল্লী– সন্ত নগর মেইন রোড, ১১০০৬৫।
৩১। নিউ দিল্লী– ১৪/৬৩, পাঞ্জাবী বাগ, ১১০০২৬।

৩২। পাণ্ডারপুর, মহারাষ্ট্র– হরেকৃষ্ণ আশ্রম (চন্দ্রভাগা নদীর তীরে), জেলা– শোলাপুর, ৪১৩৩০৪।

৩৩। পাটনা, বিহার– রাজেন্দ্রনগর, রোড নং ১২,৮০০০১৬।

৩৪। পুণে, মহারাষ্ট্র– ৪, তারাপুর রোড, ক্যাম্প - ৪১১০০১।

৩৫। পুরী, ওড়িশা– শিপসুরুবুলী পুরী, জেল–পুরী।

৩৬। পুরী, ওড়িশা– ভক্তি কুঠি, স্বর্গদ্বার, পুরী।

৩৭। সেকেন্দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ– ২৭, সেন্ট জন রোড - ৫০০০২৬।

৩৮। শিলচর, আসাম– অম্বিকাপট্টি, শিলচর, জেলা-চাচর, ৭৮৮০০৪।

৩৯। শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ– গীতালপাড়া, ৭৩৪৪০১।

৪০। সুরাট, গুজরাট– র‍্যান্ডার রোড, জাহাঙ্গীরপুর, ৩৯৫০০৫।

৪১। তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ– কে. টি. রোড, বিনায়ক নগর, ৫১৭৫০৭।

৪২। ত্রিবান্দ্রম, কেরালা– টি. সি. ২২৪/১৪৮৫, ডব্লিউ. সি. হসপিটাল রোড, থাইকুড- ৬৯৫০১৪।

৪৩। উধমপুর, জম্মু ও কাশ্মীর– শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রম, প্রভুপাদ মার্গ, প্রভুপাদ নগর, উধমপুর–১৮২১১০।

৪৪। বল্লভ বিদ্যানগর, গুজরাট– ইসকন, হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড - ৩৩৮১২০।

৪৫। বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ– কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির, ভক্তিবেদান্ত স্বামী মার্গ, রমনরেতি, জেলা-মথুরা, ২৮১১২৪।

বৈদিক কৃষিখামাবর-ভিত্তিক সমাজ (ভারতেঃ)

৪৬। আমেদাবাদ জেলা, গুজরাট– হরেকৃষ্ণ ফার্ম, কাটওয়াড়া।

৪৭। আসাম– কর্ণমধু, জেলা-করিমগঞ্জ

৪৮। চার্মোষী, মহারাষ্ট্র– ৭৮ কৃষ্ণনগর ধাম, জেলা– গাধাছিরোলি, ৪৪২৬০৩।

জানেন কি?

শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান, ভগবদ্ধাম, ইসকনের বিশ্ব মুখ্যকেন্দ্র

কলকাতা

শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থান

শ্রীল প্রভুপাদ

সত্তর বছর সয়সে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, স্থাপন করেন ইসকন।

শ্রীকৃষ্ণ

হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং দেবদেবীসহ সকলে তাঁর সেবারত দাসদাসী।

পাশ্চাত্য জগতের প্রথম রথযাত্রা

১৯৬৭ সালে সান ফ্রানসিসকো শহরে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। পরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে তা ছড়িয়ে পড়ে। এখন বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরে বিশাল আকারে রথযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রতিদিন

ইসকন ভক্তবৃন্দ মিলিতভাবে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৭০,৬৫০,০০০ বার ভগবানের দিব্যনাম জপ করেন।

আজ পর্যন্ত ঃ

বিশ্বব্যাপী ৩৪০টি মন্দির ও ৪৫টি কৃষিখামার স্থাপিত হয়েছে

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকনের বর্তমানে সারা বিশ্বে ৩৪০টি মন্দির ও ৪৫টি কৃষিখামার রয়েছে, এমনকি রয়েছে প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রে, পূর্ব ইউরোপে, লেবানন, ইজরায়েল ও পাকিস্তানে। প্রতিবছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন ইসকন কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে।

৫০০ লক্ষেরও অধিক বৈদিক শাস্ত্র-সমন্বিত গ্রন্থাবলী বিতরণ হয়েছে

গত ত্রিশ বছরে ইসকন মন্দিরগুলি ৫০০ লক্ষের অধিক বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ বিতরণ করেছে, যার অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত। এগুলি বিশ্বের সর্বত্র ৭০টিরও অধিক ভাষায় প্রচালিত হয়েছে।

কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রসাদ বিতরিত হয়েছে

রবিবাসরীয় প্রীতিভোজে ও বিনামূল্যের বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসকন মন্দিরগুলি ৮৫৫ লক্ষ পাত্র প্রসাদ পরিবেশন করেছে।

হাজার -হাজার পারমার্থিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে

ইসকন বিশ্বের সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করতে পাঁচটি মহাদেশে ৩০০টিরও অধিক রথাযাত্রা মহোৎসব মঞ্চস্থ করেছে ও প্রধান ধর্মীয় ছুটির দিনগুলিতে বহুসহস্র দিব্যানন্দময় উৎসব সংগঠিত করে চলেছে।

ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন

শ্রীল প্রভুপাদ আমিষাহার, নেশাসক্তি, জুয়া ও অবৈধ যৌনতার ন্যায় পাপকর্ম হতে মুক্ত, যাথার্থ শুদ্ধ বৈষ্ণব সদাচারের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করেছেন, তাদের আদর্শ বৈষ্ণবে পরিণত করছেন।

সমস্ত সংখ্যাই এখন দ্রুতবর্দ্ধমান

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন– ইসকন শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, শ্রীমায়াপুর নদীয়া,

ফোন ঃ- (০৩৪৭২) ৪৫-২৭৫, ২৩৪

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

যাঁরা এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। এঁদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেনঃ গুণগ্রাহী গোস্বামী, রঘুবীর দাস, বেদগুহ্য দাস, মহামন্ত্র দাস, কৃষ্ণকীর্তিদাস, জড়ভরত দাস, নারদ ঋষি দাস, বরদকৃষ্ণ দাস, রমানন্দ দাস, লক্ষণ দাস, ভক্ত জন, ভক্ত চার্লস, গ্রেন ডস, গঙ্গামাতা দাসী, বিজয় লক্ষ্মী এবং ভক্ত মুরলী।

গ্রন্থাকার

ভক্তি বিকাশ স্বামী ১৯৫৭ সালে ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসকনে যোগদান করেন ১৯৭৫ সালে। তিনি ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের একজন দীক্ষিত শিষ্য। ১৯৭৭ সালে থেকে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ইসকনের প্রচার কার্যক্রমে সাহায্য করছেন। ১৯৮৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

==============